CRPARP

"গাছ লাগাই, বন বাঁচাই।। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাই"

উপকূলীয় এলাকার গাছপালার পরিচিতি

জলবায়ু সহিষ্ণু অংশগ্রহণমূলক বনায়ন প্রকল্প: বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম
বাস্তবায়নে: আরণ্যক ফাউন্ডেশন, বন বিভাগ এবং অংশীদার সংস্থাঃ ইপসা ও উত্তরণ

ARANNAYK FOUNDATION
Conserving forests for the future

UTTARAN

BCCRF
Bangladesh Climate Change Resilience Fund

THE WORLD BANK
IBRD • IDA

রচনায়
মোঃ হারুন-উর-রশীদ
ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

সম্পাদনায়
ফারহানা খান পুষ্পা
মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল

প্রকাশকাল
মার্চ ২০১৭

প্রকাশনায়
আরণ্যক ফাউন্ডেশন

স্বত্ত্ব সংরক্ষিত
আরণ্যক ফাউন্ডেশন

মুদ্রণে
মুক্তি প্রিন্টার্স
মোবাঃ ০১৮১৯ ২৩০ ২১০
ই-মেইলঃ muktiprinters@gmail.com

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল দেশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের বন-উজাড়ের হারও বেড়ে চলেছে। আমাদের দেশটি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নানা ধরনের ঝুঁকিতে থাকে। এ ঝুঁকি মোকাবেলায় সমগ্র উপকূলব্যাপী গাছ লাগানো এবং যে সব গাছ রয়েছে সেগুলি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলে বন সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন বিভাগ ও আরণ্যক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ডের অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় যৌথভাবে ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরী এফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন শিরোনামের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর উপকূলীয় নয়টি জেলায় (কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা) জনগণকে সম্পৃক্ত করে ১৭,৫০০ হেক্টর বনায়ন সৃজন এবং ২,০০০ কিলোমিটার সড়ক বনায়ন করেছে। পক্ষান্তরে আরণ্যক ফাউন্ডেশন উল্লেখিত নয়টি জেলার ২০০ গ্রামের ৬,০০০ বন নির্ভরশীল জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে বিকল্প জীবিকায়নের মাধ্যমে বন নির্ভরশীলতা কমিয়ে বন সংরক্ষণ করেছে।

আরণ্যক ফাউন্ডেশনের বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রমের মধ্যে ছিল বন নির্ভর প্রত্যেক পরিবারে উন্নত চুলা ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানির চাহিদা হ্রাস করা, বাড়ির চারপাশে গাছ লাগিয়ে পুষ্টি এবং জ্বালানি কাঠের চাহিদা পূরণে সক্ষম করে তোলা এবং জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসের অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা, বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির চাষ ও হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালনের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা।

ইতিমধ্যে নির্ধারিত ৬,০০০ পরিবার এবং আশ-পাশের পরিবারসমূহ বিভিন্ন প্রজাতির লক্ষাধিক চারা লাগিয়েছে। প্রতিনিয়ত অনেকে জানতে চায় তারা তাদের বসতবাড়িতে এবং পতিত জমিতে কি কি গাছ লাগাতে পারে এবং কিভাবে লাগানো গাছের যত্ন নেবে। যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি কিছুটা লবণাক্ত তাই সেখানে কি কি গাছ লাগানো যেতে পারে এবং কি কি ব্যবস্থাপনা নিতে হবে তার একটি ধারণা দেয়ার জন্যই এ বইটি লেখা হয়েছে। বইটিতে প্রতিটি প্রজাতির গাছের বর্ণনা ছাড়াও গাছের কাঠ বা অন্যান্য অংশ কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যারা এসব গাছের চারা উৎপাদনের জন্য নার্সারি করতে চায় তারা বইটি পড়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাবে। এসব গাছ পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক বেষ্টনী স্বরূপ কাজ করবে। এ প্রাকৃতিক বেষ্টনী তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সর্বাত্মক সহায়তা করবে।

গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো স্থানভেদে গাছের প্রজাতি নির্বাচন। সেই সাথে চারা রোপণের পদ্ধতি, ফুল-ফলের পরিচিতি, গাছের ব্যবহার, প্রজনন ও বংশবিস্তার এবং গাছের গুরুত্ব ও ব্যবহার সম্পর্কেও এ বইতে ধারণা দেয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার স্কুলের শিক্ষকগণ তাদের শিক্ষার্থীদের এসব গুরুত্বপূর্ণ গাছের সাথে পরিচিত করিয়ে দিতে পারবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা সঠিক প্রজাতির গাছ লাগাতে আগ্রহী হয়। এ বইয়ের সহায়তায় পাঠকগণ এ সকল গাছকে চিনে তাদের গুরুত্ব জেনে গাছগুলো রক্ষায় সফল ভূমিকা পালন করতে পারবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় উপকূলের এক একটি বসতবাড়ির চারপাশে থাকবে জলবায়ু সহিষ্ণু গাছের প্রাকৃতিক বেষ্টনী, এক একটি উপকূলীয় গ্রাম জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলায় হয়ে উঠবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ফরিদ উদ্দিন আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক
আরণ্যক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

- **উপকূলীয় বনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি**
  - ম্যানগ্রোভ বন ০৪
  - উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন করার উদ্দেশ্য ০৫
  - উপকূলীয় বনের ম্যানগ্রোভ প্রজাতি ০৫
- **উপকূলীয় বনের ম্যানগ্রোভ গাছপালার পরিচিতিমূলক বিবরণ**
  - ওরা বা ছইলা ০৫
  - করঞ্জা ০৭
  - কিরপা বা কৃপা ০৮
  - কেওড়া ১০
  - খলশী বা খলিশা ১২
  - গরান ১৩
  - গেওয়া ১৪
  - গোলপাতা ১৬
  - ধুন্দুল ১৮
  - পশুর ১৯
  - বাইন বা কালা বাইন ২০
  - সুন্দরী ২২
- **উপকূলীয় জনপদ এলাকায় লাগানো-গাছপালার পরিচিতিমূলক বিবরণ**
  - আকাশমনি ২৪
  - কালোজাম ২৫
  - খৈ-বাবলা বা খৈয়া বাবলা ২৬
  - পূন্যাল বা পনিয়াল ২৮
  - মেহগনি বা বড় মেহগনি ২৯
  - রাজকড়ই বা চাম্বল ৩১
  - শিল কড়ই ৩২
  - রেণ্ডি কড়ই বা রেইন ট্রি ৩৩
  - লম্বু ৩৫
  - তাল ৩৬
  - সুপারি ৩৮
  - দেশি গাব ৪১
  - বিলাতি গাব ৪২
- **উপকূলীয় গ্রামীণ এলাকার বাঁশের পরিচিতিমূলক বিবরণ**
  - বোরাক বাঁশ ৪৪
  - বাঁইজ্যা বাঁশ ৪৫
  - তল্লা বাঁশ ৪৭

উপকূলীয় বনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ম্যানগ্রোভ বন

ম্যানগ্রোভ বা প্যারাবন (mangrove forests) হচ্ছে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় নদীর মোহনা ও সমুদ্র বক্ষে জেগে ওঠা চর ভূখণ্ডে প্রাকৃতিকভাবে এবং মানব সৃষ্ট বন ও বনের গাছপালা যা প্রতিদিন দুবার জোয়ার-ভাটার লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত হয়ে থাকে। ম্যানগ্রোভ বনকে স্রোতজ বন (littoral forests) বলা হয়। বাংলাদেশে দু ধরনের ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে-

(১) প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন: এ বনের অবস্থান হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ প্রান্তের সমতল কাদা মাটিতে। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন বা সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ একক অখন্ড বন। প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার (৫,৭৭,০০০ হেক্টর) ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রয়েছে বাংলাদেশে এবং অবশিষ্ট আয়তনের বনাঞ্চল রয়েছে বাংলাদেশের সুন্দরবন সীমানা সংলগ্ন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। বাংলাদেশের সুন্দরবন ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছাড়া কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলার দক্ষিণ প্রান্তে সাগরের তীর ঘেঁষে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা "চকোরিয়া সুন্দরবন" যার অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে।

(২) সমুদ্র উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন: এ বন ও বনের গাছপালা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নয়, মানব সৃষ্ট বন। ২০১৬ সাল পর্যন্ত দুই লক্ষ হেক্টর উপকূলীয় এলাকায় বন সৃজন করা হয়েছে। সমুদ্র উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে সৃজিত বা বনায়নকৃত ম্যানগ্রোভ বন যা উপকূলীয় এলাকার নদীর মোহনা ও বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা নতুন চরভূমিতে ম্যানগ্রোভ প্রজাতি লাগিয়ে সৃজন করা হয়েছে। বনায়নকৃত উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনগুলো বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাসমূহের উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত।

উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়ন করার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব দিক পর্যন্ত ১৯টি জেলা ও ১৪৮টি উপজেলা নিয়ে উপকূলীয় অঞ্চল গঠিত। উপকূলীয় অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্ত সাতক্ষীরা জেলার কৈখালী থেকে শুরু করে পূর্ব প্রান্ত কক্সবাজার জেলার টেকনাফ পর্যন্ত ৭১০ কিলোমিটার সমুদ্রতটরেখা রয়েছে। সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে বৃক্ষরাজির সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং জেগে ওঠা নতুন চর ভূমিকে স্থায়ীরূপদানে বন অধিদপ্তর ১৯৬০ সাল থকে উপকূলীয় বাঁধে এবং ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে উপকূলীয় এলাকার নদীর মোহনা ও বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা নতুন চরভূমিতে ম্যানগ্রোভ প্রজাতি লাগিয়ে উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম শুরু করে।

উপকূলীয় বনের ম্যানগ্রোভ প্রজাতি

উপকূলীয় বন সৃজনে বা বনায়নে কেওড়া হচ্ছে প্রধান ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ প্রজাতি এবং বাইন হচ্ছে দ্বিতীয় বৃক্ষ প্রজাতি। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ লাগিয়ে উপকূলীয় বনকে সমৃদ্ধশালী করা হয়েছে। এ বনে অন্যান্য গাছের মধ্যে রয়েছে খলশী, আমুর, গেওয়া, গরান, কাঁকড়া, সিংড়া, গোলপাতা, হেঁতাল, করঞ্জা, হারগোজা কাঁটা, ঝানা, নোনা ঝাউ, ছইলা বা ওরা, পশুর, ধুন্দুল, সুন্দরী ইত্যাদি। সুন্দরী হচ্ছে সর্বশেষ ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ প্রজাতি যা দিয়ে ম্যানগ্রোভ বনের পূর্ণতা লাভ করে।

উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনের গাছপালার পরিচিতিমূলক বিবরণ

উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে যে সব গাছ লাগানো হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

ওরা বা ছইলা

বাংলা ও স্থানীয় নাম: ওরা, ওরাহ, ওরালি, ওরছা (সুন্দরবন), ছইলা (বরিশাল) ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Sonneratia caseolaris*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

ছইলা একটি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ স্রোতজ প্রজাতির গাছ (littoral species)। প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চলের কম লবণাক্ত এলাকায়, কক্সবাজারের চকোরিয়া সুন্দরবন এবং চট্টগ্রাম, ভোলা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরার উপকূলীয় বন এলাকার নদী ও খালের তীর ঘেঁষে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ছইলা গাছের বিস্তৃতি রয়েছে।

গাছের বিবরণ

ছইলা ছোট থেকে মাঝারি আকৃতির দ্রুত বর্ধনশীল চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৬-১৫ মিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়ার চারপাশে লম্বাটে শ্বাসমূল বা নিউম্যাটোফোর রয়েছে। বাকল পুরু, মসৃণ এবং ধূসর বা বাদামি বর্ণের। পাতা পুরু, ডিম্বাকার, কিনারা মসৃণ ও আগা ভোঁতা। আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ডালপালার মাথায় একক বড় আকারের লালচে বর্ণের হালকা মিষ্টি ঘ্রাণ বিশিষ্ট ও মধুযুক্ত ফুল ফোটে। ফল গোলাকার ও চাপা, আবরণ মসৃণ, মধ্যস্তক মাংসল, স্থায়ী বৃতিযুক্ত এবং শেষ প্রান্তভাগে রয়েছে লম্বাটে সরু স্টাইল। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পরিপক্ক ফল হলুদাভ বর্ণের হয়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পরিপক্ক ফল গাছ থেকে ঝরে পড়ে পানিতে ভাসতে থাকে এবং ফলের বীজগুলো নদী ও খালের তীর বেষ্টিত কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা ও গাছ জন্মায়। উপকূলীয় বনায়নে সীমিত আকারে ছইলার চারা লাগানো হয়। ছইলা গাছ কপিচিং (coppicing) ক্ষমতা সম্পন্ন। অর্থাৎ কর্তনকৃত ছইলা গাছের গোড়ার মুথা থেকে প্রাকৃতিক ভাবে একাধিক কুশি/ চারা গজায় যা পরবর্তীতে বড় গাছে পরিণত হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

সার কাঠ ধূসর বর্ণের, হালকা, নিম্ন মানের ও কম টেকসই। জ্বালানি হিসেবে এবং কাগজের মণ্ড ও টেক্সটাইল মিলের ববিন তৈরিতে এ কাঠ ব্যবহার করা হয়। ফুল থেকে মধু পাওয়া যায়। ছইলার পাকা ফল টক স্বাদযুক্ত বিধায় উপকূলীয় এলাকার লোকজন কাঁচা ও রান্না করে খায়। পাতা চিত্রা হরিণ ও গবাদি-পশুর প্রিয় খাবার। ছইলার গাছের শ্বাসমূল দিয়ে বোতলের মুখের ছিপি বানানো হয়।

করঞ্জা

বাংলা ও স্থানীয় নাম: করঞ্জা (সুন্দরবন), সিতা-সরা, পিঠা-হরা (বরিশাল), কেরং বা কেরুং (চট্টগ্রাম), করছন (সিলেট), দাল করমচা, কেরুম, পিতাগরিয়া, কারমুজ ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Pongamia pinnata*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

করঞ্জা একটি ম্যানগ্রোভ সহযোগী প্রজাতি। ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চলের কম লবণাক্ত ও মধ্যবর্তী অঞ্চলের মধ্যম লবণাক্ত এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে নদী-খাল ও নালার কিনারায় জন্মাতে দেখা যায়। তবে সুন্দরবনের পশ্চিমাঞ্চলের তীব্র লবণাক্ত এলাকায় এর বিস্তৃতি দেখা যায় না। উপকূলীয় এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে রাস্তার ধারে, খাল-নালার তীর ঘেঁষে জন্মানো করঞ্জা গাছ দেখা যায়। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার বনাঞ্চলের স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ও বৃহত্তর সিলেটের হাওর বেষ্টিত স্বাদু পানির জলাভূমির বন বা জলামগ্ন এলাকায় করঞ্জা গাছের বিস্তৃতি রয়েছে।

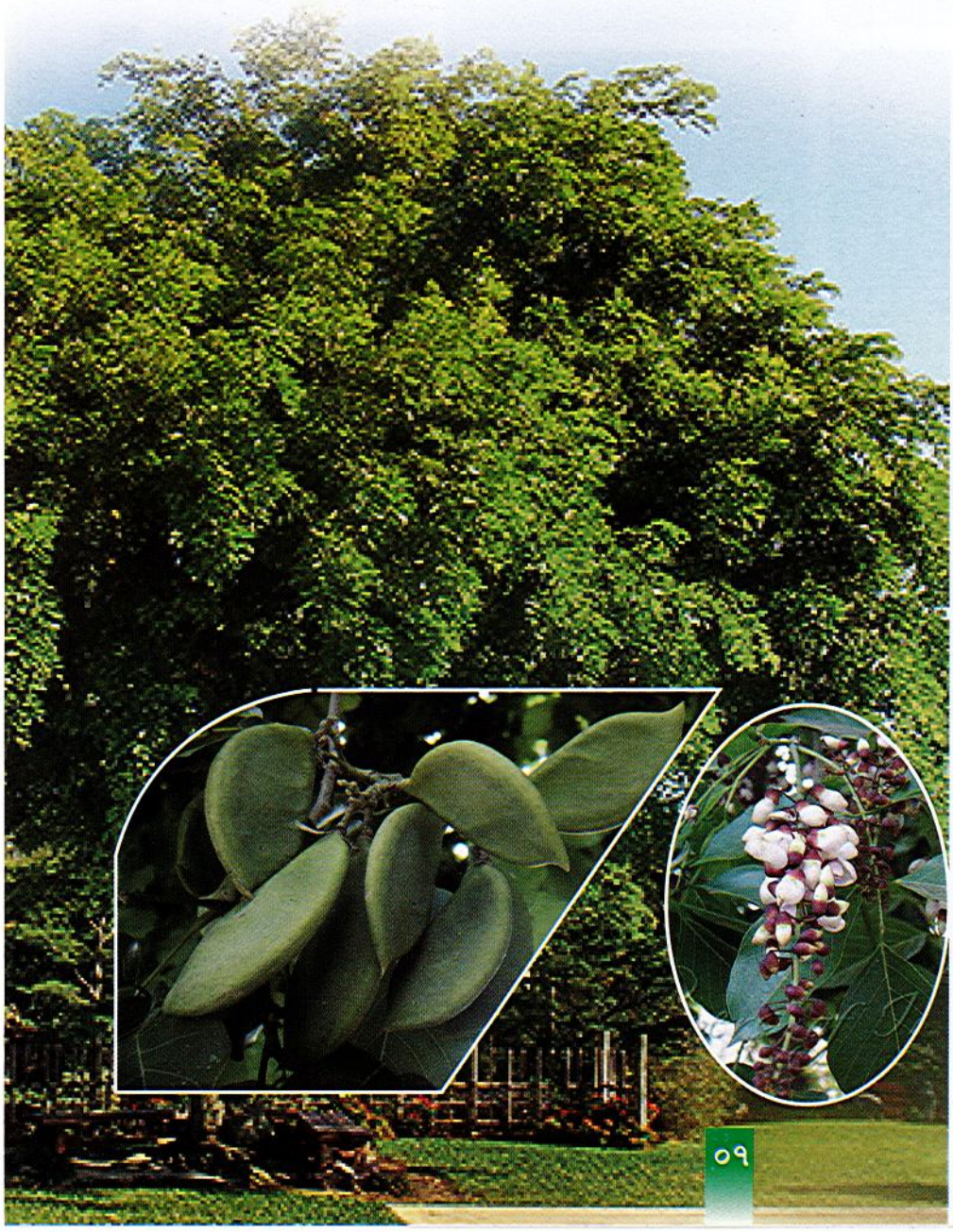

গাছের বিবরণ

করঞ্জা মাঝারি আকৃতির ডালপালাযুক্ত চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ১০-১৫ মিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কাণ্ড খাটো, গোলাকার এবং বাকল পুরু, মসৃণ ও ধূসর-বাদামি বর্ণের। পাতা যৌগিক এবং পত্রক সংখ্যা ৫-৯টি। পত্রকগুলো আয়তাকার, কিনারা মসৃণ ও আগা সূচালো। এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত লম্বা পুষ্পবিন্যাসে শিমের ফুলের ন্যায় প্রজাপতি সদৃশ ছোট আকারের লাল-নীল মিশ্রিত সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফল পড ধরনের কাষ্ঠল চ্যাপ্টা ডিম্বাকার, পৃষ্ঠভাগ মসৃণ এবং ফলের শেষপ্রান্তভাগ ঠোঁটের ন্যায় বাঁকানো। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পরিপক্ক ফল হালকা বাদামি বর্ণ ধারণ করে। প্রতিটি ফলে গাঢ় বাদামি বর্ণের ১টি করে শিমের বীজের ন্যায় বীজ থাকে এবং বীজের শ্বাস সাদাটে ও তেলযুক্ত।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

ম্যানগ্রোভ বন এলাকায় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পরিপক্ক ফল পানিতে পড়ে ভাসতে থাকে এবং বীজগুলো বনের কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। এ গাছ কপিচিং (coppicing) ক্ষমতা সম্পন্ন। অর্থাৎ কর্তনকৃত করঞ্জা গাছের গোঁড়ার মুথা থেকে প্রাকৃতিকভাবে একাধিক কুশি/চারা গজায় যা পরবর্তীতে বড় গাছে পরিণত হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

কাঠ হলুদাভ ধূসর বর্ণের এবং মধ্যম শক্ত ও ভারী। তবে কাঠ তেমন মজবুত ও টেকসই নয় এবং কীটপতঙ্গে সহজে নষ্ট করে। কাঠ জ্বালানি হিসেবে, ঘরের অভ্যন্তরীণ নির্মাণ কাজে, কৃষি কাজের যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কীটপতঙ্গের হাত থেকে শস্যদানা সংরক্ষণে এ গাছের শুকনা পাতা ব্যবহার করা হয়। ফুল তরকারি হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায়। ফলের শ্বাস থেকে কমলা রঙের "করঞ্জা তেল" নামক তেল পাওয়া যায় যা সাবান তৈরিতে, বার্নিশ কাজে, প্রদীপ জ্বালাতে, যন্ত্রপাতিতে লুব্রিক্যান্ট হিসেবে, কীটনাশক তৈরিতে, ট্যানিন কারখানায় এবং বাত ও চর্ম রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। উপকূলীয় এলাকায় ভাঙ্গন রোধে বেড়ীবাঁধ, নদী-নালা ও খালের কিনারায় এবং বৃহত্তর সিলেটের হাওর বেষ্টিত জলামগ্ন এলাকায় পানির ঢেউয়ের তীব্রতা রোধে করঞ্জা গাছের চারা লাগানো হয়।

কিরপা বা কৃপা

বাংলা ও স্থানীয় নাম: কিরপা (সুন্দরবন), কৃপা ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Lumnitzera racemosa*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো কতিপয় কিরপা গাছ দেখা যায়। উপকূলীয় বনগুলোতে লাগানো কিছু কিরপা গাছ রয়েছে। ২০১২ সালের প্রণীত বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনে কিরপা গাছ রক্ষিত উদ্ভিদ (Protected Plant) হিসেবে অভিহিত।

গাছের বিবরণ

কিরপা ছোট আকৃতির প্রচুর ডালপালাযুক্ত চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৫-১০ মিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়াতে কোনো শ্বাসমূল বা নিউম্যাটোফোর নেই। প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা, গোলাকার। বাকল অমসৃণ, পুরু ও বাদামি বা লালচে বাদামি বর্ণের। পাতা পুরু, ডিম্বাকার, কিনারা মসৃণ এবং আগা গোলাকার ও খাঁজ কাটা। এপ্রিল-মে মাসে ছোট আকারের সাদা বর্ণের ঘ্রাণযুক্ত ফুল ফোটে। ফল টিউব আকৃতির এবং স্থায়ী বৃতিযুক্ত। জুলাই-আগস্ট মাসে পরিপক্ক ফল গাঢ় বাদামি বর্ণ ধারণ করে। ফলগুলো একক বীজ বিশিষ্ট।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

জুলাই-আগস্ট মাসে পরিপক্ক বীজগুলো লবণাক্ত পানিতে পড়ে ভাসতে থাকে এবং বনের কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। চারা গাছের পাতা হরিণের প্রিয় খাবার হওয়ায় সুন্দরবন ও উপকূলীয় বনে প্রাকৃতিকভাবে চারা থেকে বড় গাছে পরিণত হতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

কাঠ বেশ শক্ত, মজবুত ও টেকসই এবং হালকা বাদামি বর্ণের। কাঠ জ্বালানি এবং কয়লা উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। গাছের প্রধান কাণ্ড ঘরের খুঁটি, ব্রিজ/পুল ও নৌকা তৈরিতে এবং পাইলিং কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকল থেকে ট্যানিন পাওয়া যায়।

কেওড়া

বাংলা ও স্থানীয় নাম: কেওড়া (সুন্দরবন), কেরবা (চকোরিয়া সুন্দরবন) ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Sonneratia apetala*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

কেওড়া একটি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ স্রোতজ প্রজাতি (littoral species) এবং উপকূলীয় বনায়নে প্রথম ধাপের প্রধান প্রজাতি (principal species)। কেওড়া গাছের বিস্তৃতি রয়েছে প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ এবং উপকূলীয় বনায়নে শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ। প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের সাগর তীরবর্তী এলাকা, নদীর মোহনার তীব্র লবণাক্ত এলাকায় একক কেওড়া গাছের বিস্তৃতি রয়েছে। কক্সবাজারের চকোরিয়া সুন্দরবন ও টেকনাফের নাফ নদীর তীরে এবং কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরার উপকূলীয় এলাকার নদীর মোহনায় জেগে ওঠা চরে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো এবং লাগানো একক প্রজাতি হিসেবে কেওড়া গাছের বিস্তৃতি রয়েছে।

গাছের বিবরণ

কেওড়া ম্যানগ্রোভ বনের সবচেয়ে উঁচু আকৃতির অতি দ্রুত বর্ধনশীল চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ১৫-২০ মিটার এবং গাছের বেড় ৩০-৭০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। গাছের চারপাশে স্পঞ্জি ধরনের লম্বাটে শ্বাসমূল বা নিউম্যাটোফোর রয়েছে। প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা ও নলাকার। গাছের ডালপালাগুলো ঝুলন্ত ধরনের। বাকল পুরু, অমসৃণ এবং গাঢ় ধূসর বর্ণের। পাতা পুরু, আয়তাকার, লম্বাটে, কিনারা মসৃণ ও আগা ভোঁতা। এপ্রিল-মে মাসে পুষ্পবিন্যাসে ৩-৫টি করে সাদাটে বা হলুদাভ-সাদা বর্ণের বড় আকারের ফুল ফোটে। ফুলগুলো হালকা মিষ্টি ঘ্রাণ বিশিষ্ট ও মধুর উৎস নেক্টারযুক্ত। ডালপালার মাথায় গুচ্ছাকারে সবুজ বর্ণের ফল ধরে। ফল গোলাকার আবরণ মসৃণ, মধ্যস্তক মাংসল ও স্থায়ী বৃতিযুক্ত। জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে পরিপক্ক ফল হালকা হলুদাভ বর্ণ ধারণ করে। প্রতি কেজিতে ফলের সংখ্যা প্রায় ১৪০-১৫০টি এবং বীজগুলো ক্ষুদ্রাকার শক্ত ত্রিকোণাকার অনিয়মিত আকৃতির।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

সাধারণত বন এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বীজজাত চারা দিয়ে বংশ বিস্তার হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পরিপক্ক ফল গাছ থেকে ঝরে পড়ে লবণাক্ত পানিতে ভাসতে থাকে এবং ফলের বীজগুলো উপকূলীয় বন ও জেগে ওঠা নতুন চরের কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। এ সকল চারা অতি দ্রুত বেড়ে ওঠে একক কেওড়া বন সৃষ্টি করে। কৃত্রিমভাবে উপকূলীয় এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চরে কেওড়া চারা লাগানো হয়। কেওড়া গাছ কপিচিং (coppicing) ক্ষমতা সম্পন্ন। অর্থাৎ কর্তনকৃত কেওড়া গাছের গোড়ার মুথা থেকে প্রাকৃতিকভাবে একাধিক কুশি/চারা গজায় যা পরবর্তীতে বড় গাছে পরিণত হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

সার কাঠ হালকা লালচে-বাদামি বর্ণের, হালকা, নিম্ন মানের ও কম টেকসই। জ্বালানি হিসেবে এবং দিয়াশলাই বক্স, প্যাকিং বক্স, হার্ডবোর্ড, কাগজের মণ্ড, টেক্সটাইল মিলের ববিন তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক খুঁটি হিসেবে লগ ব্যবহার করা হয়। ফুল থেকে মধু পাওয়া যায়। পাতা ও ফল চিত্রা হরিণের প্রিয় খাবার। উপকূলীয় এলাকার লোকজন কেওড়া ফল রান্না এবং আচার করে খায়। ফুল থেকে 'কেওড়া জল' তৈরি করা হয়।

খলশী বা খলিশা

বাংলা ও স্থানীয় নাম: খলশী, খুলশী, খলিশা, খলশা (সুন্দরবন), কাসালং ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Aegiceras corniculatum*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মানো খলশী গাছ রয়েছে এবং পশ্চিমাঞ্চলের তীব্র লবণাক্ত এলাকার নদ-নদীর তীর বেষ্টিত নতুন চরে প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়। উপকূলীয় বনাঞ্চলে লাগানো খলশীর গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ

খলশী ছোট আকৃতির হালকা ডালপালাযুক্ত চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ২-৭ মিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়াতে কোনো শ্বাসমূল নেই। প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা, নলাকার। বাকল মসৃণ, পুরু, বাদামি বা সবুজাভ বর্ণের। পাতা আয়তকার ও লম্বাটে, কিনারা মসৃণ ও আগা গোলাকার। মার্চ-এপ্রিল মাসে ডালপালার শেষপ্রান্তে বা পাতার কক্ষে গুচ্ছাকারে ১০-৩০টি ছোট আকারের সাদা বর্ণের মিষ্টি ঘ্রাণ ও মধুযুক্ত ফুল ফোটে। গুচ্ছাকারে ঝুলে থাকা ফলগুলো স্থায়ী বৃতিযুক্ত বাঁকানো টিউব আকৃতির, শেষপ্রান্ত সূচালো। জুলাই-আগস্ট মাসে পরিপক্ক ফল হালকা সবুজাভ ও লালচে মিশ্রিত বর্ণ ধারণ করে। ফলগুলো একক বীজ বিশিষ্ট।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

জুলাই-আগস্ট মাসে পরিপক্ক বীজগুলো লবণাক্ত পানিতে পড়ে ভাসতে থাকে এবং বনের কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

প্রধান কাণ্ড দিয়ে ঘরের খুঁটি, জ্বালানি এবং কয়লা তৈরি করা হয়। কাঠ নিম্ন মানের লালচে বাদামি বর্ণ। ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে খলশী ফুল থেকে উন্নত মানের সাদা বর্ণের মধু পাওয়া যায়। বাকল থেকে ট্যানিন পাওয়া যায়।

গরান

বাংলা ও স্থানীয় নাম: গরান (সুন্দরবন), গুইট্টা বা গুট্টিয়া (চকোরিয়া সুন্দরবন) ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Ceriops decandra*

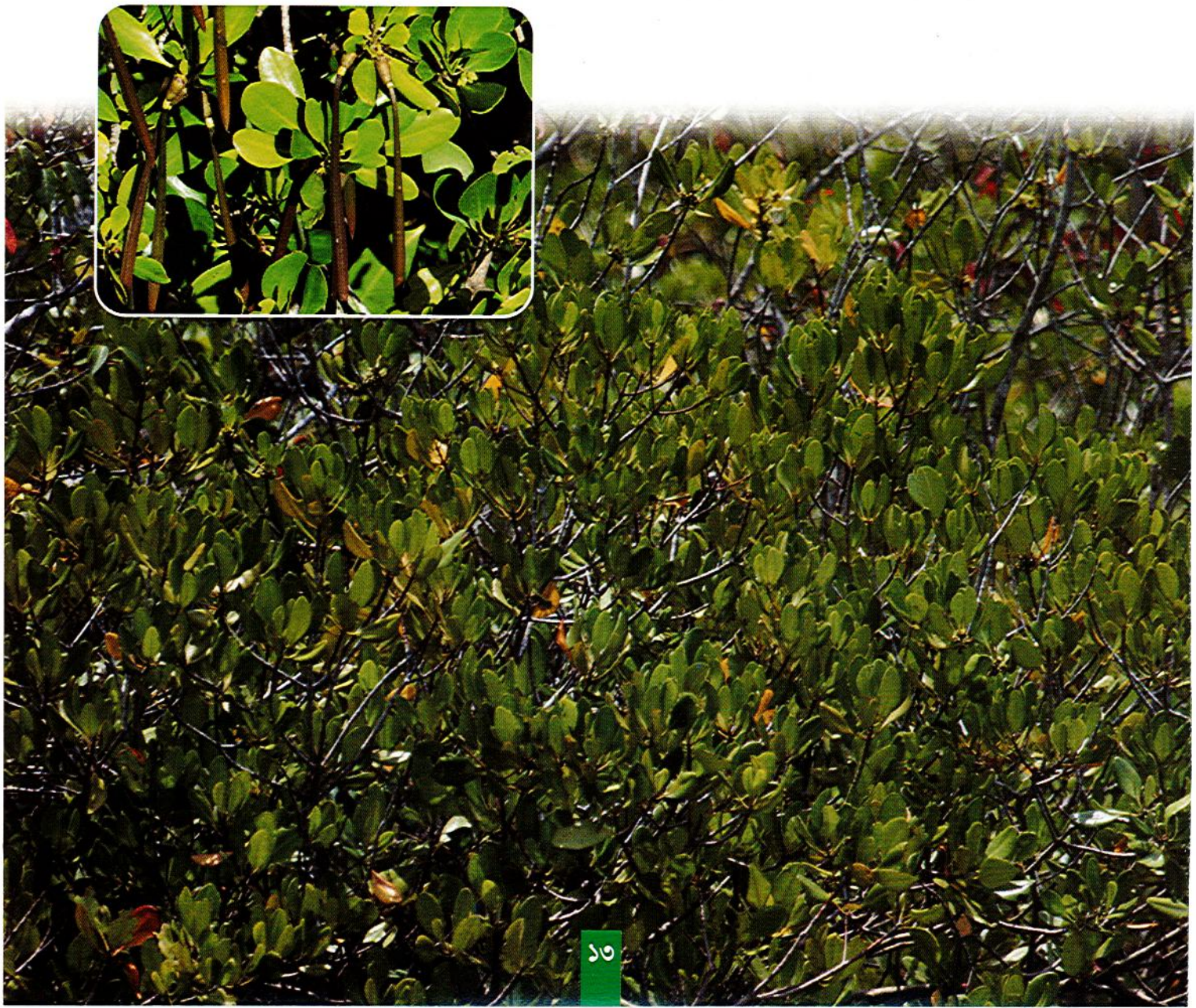

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলের তীব্র লবণাক্ত এলাকার উন্মুক্ত স্থানসহ নদী ও খালের তীর বেষ্টিত স্থানে প্রাকৃতিকভাবে অধিকহারে গরান জন্মাতে দেখা যায়। এ ছাড়া চকোরিয়া সুন্দরবনসহ বরগুনা, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের উপকূলীয় বন এলাকায় লাগানো গরান গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ

গরান একটি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ। এটি গুল্ম প্রকৃতির ঝোপালো ঘন ডালপালাযুক্ত চিরসবুজ গাছ, উচ্চতায় ১.৫-৪.০ মিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়াতে ঠেসমূল (buttress) এবং কাণ্ড থেকে বায়বীয় শিকড় গজাতে দেখা যায়। প্রধান কাণ্ড খাটো গোলাকার এবং বাকল মসৃণ, পুরু ও ধূসর বা বাদামি বর্ণের। পাতা পুরু, আয়তকার, কিনারা মসৃণ ও আগা গোলাকার। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত পাতার কক্ষে গুচ্ছাকারে ছোট আকারের মিষ্টি ঘ্রাণ ও প্রচুর মধুযুক্ত সবুজাভ সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। গুচ্ছাকার ফলগুলো ছোট মোচাকৃতি, স্থায়ী বৃতিযুক্ত ও বাদামি বর্ণের। ফল একক বীজ বিশিষ্ট। গাছে থাকা পরিপক্ক ফল থেকে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে লম্বাটে নলাকার প্রোপাগুলস (propagules) সৃষ্টি হয় যা ফলের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় ঝুলে থাকে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

মে-জুন মাসে পরিপক্ক প্রোপাগুলসগুলো লম্বায় ও ওজনে বৃদ্ধি পেয়ে এক সময় আপনা-আপনি ফল থেকে ঝড়ে পড়ে। লবণাক্ত পানিতে পড়ে ভাসতে থাকে এবং বনের কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। এ ছাড়া নার্সারিতে সংগৃহীত পরিপক্ক প্রোপাগুলসগুলো পলিথিন ব্যাগে বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়। উপকূলীয় বনায়নে গরানের চারা লাগানো হয়ে থাকে। গরান গাছ কপিচিং (coppicing) ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ কর্তনকৃত গাছের গোড়া বা মুথা থেকে প্রাকৃতিকভাবে একাধিক কুশি বা চারা জন্মায় যা পর্যায়ক্রমে বড় গাছে পরিণত হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

প্রধান কাণ্ড ঘরের খুঁটি, জ্বালানি এবং কয়লা উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। এ গাছ থেকে তেমন কাঠ পাওয়া যায় না, তবে কাঠ কমলা-লালচে বর্ণ। এ গাছের ফুল থেকে এপ্রিল-মে মাসে খয়েরি বর্ণের ঘন উন্নত মানের মধু পাওয়া যায়। সুন্দরবন থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ফুলের মধুর মধ্যে গরান ফুলের মধুর পরিমাণ সর্বাধিক। এ গাছের বাকল থেকে ট্যানিন ও রঙ পাওয়া যায় যা মাছ ধরার জাল রঙ্গিন ও শক্তকরণে ব্যবহার করা হয়।

গেওয়া

বাংলা ও স্থানীয় নাম: গেওয়া, গেঁওয়া (সুন্দরবন), গয়ান, গওয়া, গেরিয়া, গাও, গমা, গেংগোয়া ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Excoecaria agallocha*

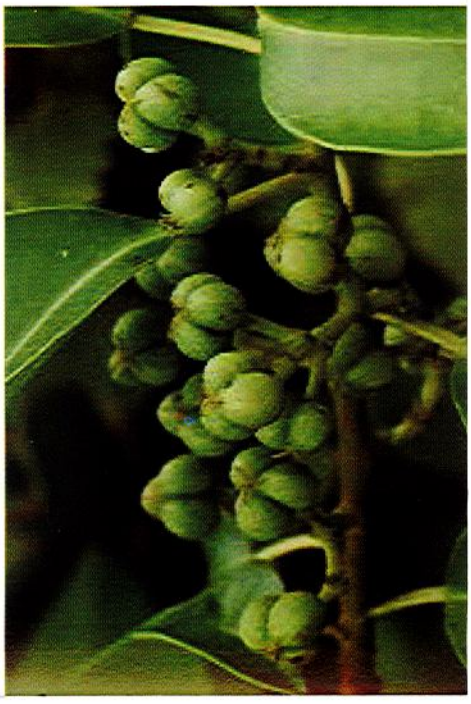

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের সব অঞ্চলে গেওয়া গাছের বিস্তৃতি রয়েছে এবং সুন্দরী গাছের পরে গেওয়া গাছের আধিক্য বেশি (প্রায় ১৬ ভাগ)। এটি কক্সবাজারের চকোরিয়া সুন্দরবনে কদাচিৎ দেখা যায় এবং টেকনাফের জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত এলাকায় কিছু গাছ রয়েছে। এ ছাড়া উপকূলীয় বন এলাকায় লাগানো গেওয়া গাছের বিস্তৃতি রয়েছে।

গাছের বিবরণ

গেওয়া ছোট থেকে মাঝারি আকৃতির ডালপালাযুক্ত পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ৫-১৫ মিটার এবং গাছের বেড় ১৫-৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। গাছের প্রতিটি অংশে দুধ সাদা বিষাক্ত কষ রয়েছে যা মানব দেহের চামড়া ও চোখের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ কষ চোখে লাগলে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। গাছের গোড়াতে কোন শ্বাসমূল নেই, তবে চারপাশে মাটির উপরিস্তরে কোঁকড়ানো আকৃতির মোটা শিকড়ের বিস্তৃতি দেখা যায়। প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা, গোলাকার এবং বাকল মসৃণ, পুরু ও গাঢ় ধূসর থেকে হালকা বাদামি বর্ণের। পাতা আয়তাকার, লম্বাটে, কিনারা মসৃণ ও আগা সূচালো। পাতা ঝরার পূর্বে পাতাগুলো হলুদাভ বা কমলা বর্ণ ধারণ করে। এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ছোট আকারের হলুদাভ বর্ণের ঘ্রাণ ও মধুযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ভিন্ন ভিন্ন গাছে ফোটে। ফল ডিম্বাকার ধরনের এবং ৩ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। জুলাই-আগস্ট মাসে পরিপক্ক ফল বাদামি বর্ণ ধারণ করে। প্রতিটি ফলে গাঢ় বাদামি বর্ণের ২-৩টি করে গোলাকার বীজ থাকে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

জুলাই-আগস্ট মাসে পরিপক্ক ফল আপনা-আপনি ফেটে গিয়ে বীজগুলো লবণাক্ত পানিতে পড়ে ভাসতে থাকে এবং বীজগুলো বনের কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। এ ছাড়া সংগৃহীত বীজ নার্সারিতে পলিথিন ব্যাগে বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়। উপকূলীয় বনায়নে গেওয়ার চারা লাগানো হয়। গেওয়া গাছ কপিচিং (coppicing) ক্ষমতা সম্পন্ন। অর্থাৎ কর্তনকৃত গেওয়া গাছের গোড়ার মুথা থেকে প্রাকৃতিকভাবে একাধিক কুশি/চারা গজায় যা পরবর্তীতে বড় গাছে পরিণত হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

কাঠ হলুদাভ বর্ণের, নরম ধরনের, কম মজবুত ও কম টেকসই। নিউজপ্রিন্ট (খবরের কাগজ), দিয়াশলাই কাঠি ও বক্স, প্যাকিং বক্স নির্মাণ কাজে এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহৃত হয়। গেওয়া ফুল থেকে মধু পাওয়া যায়, তবে স্বাদে একটু তিতা।

গোলপাতা

বাংলা ও স্থানীয় নাম: গোলপাতা, গোলগাছ (সুন্দরবন), আতপ পাম (সিঙ্গাপুর), নিপা পাম (ফিলিপাইন), নিপাহ পাম বা ম্যানগ্রোভ পাম (মালয়েশিয়া) ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Nypa fruticans*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা পূর্বাঞ্চলের কম লবণাক্ত এলাকার নদী ও খালের তীর ঘেঁষে কাদা মাটিতে প্রাকৃতিকভাবে প্রচুর গোলপাতা জন্মায়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরার উপকূলীয় বন এলাকায় লাগানো গোলপাতা দেখা যায়। এ ছাড়া উপকূলীয় এলাকায় ব্যক্তিগতভাবে লাগানো গোলপাতার বাগান রয়েছে।

গাছের বিবরণ

গোলপাতা একটি পাম জাতীয় একবীজপত্রী চিরসবুজ গাছ। এটি কাণ্ডবিহীন, তবে মাটির নিচে অনুভূমিকভাবে বিস্তৃত ভূনিম্নস্থ কাণ্ড রয়েছে। এর পাতাগুলো নারিকেল পাতার মতো যৌগিক, লম্বায় ৫.০-৯.০ মিটার, পাতার মধ্যশিরা শক্ত ডাটায় পরিণত হয় এবং ডাটার গোঁড়ার অংশ স্ফীত গোলাকার। পাতার মধ্যশিরার উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে লম্বাটে পত্রক রয়েছে এবং পত্রকগুলোর কিনারা মসৃণ ও আগা সূচালো। এপ্রিল-জুন মাসে হলুদাভ-খয়েরি বর্ণের পুষ্পপুট দ্বারা আবৃত স্প্যাডিক্স (spadics) ধরনের পুষ্পমঞ্জরি বের হয়। পুষ্পমঞ্জরির আবরণ ফেটে পুষ্পবিন্যাস ও ফুল ফোটে। পুরুষ ফুল কিছুটা উপরে থাকে এবং তার নিচে স্ত্রী ফুল অবস্থিত। ফুলগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির হলুদ বর্ণের। লম্বা ছড়ায় গুচ্ছাকারে ৫০-১২০টি ফল ধরে। ফলগুলো বড় চ্যাপ্টা ডিম্বাকার এবং শক্ত কাষ্ঠল। ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে পরিপক্ক ফল গাঢ় বাদামি বর্ণের হয়। প্রতিটি ফল একক বীজ বিশিষ্ট। বীজ বেশ শক্ত, আঁশযুক্ত এবং ভিতরে সাদা শাঁসযুক্ত।

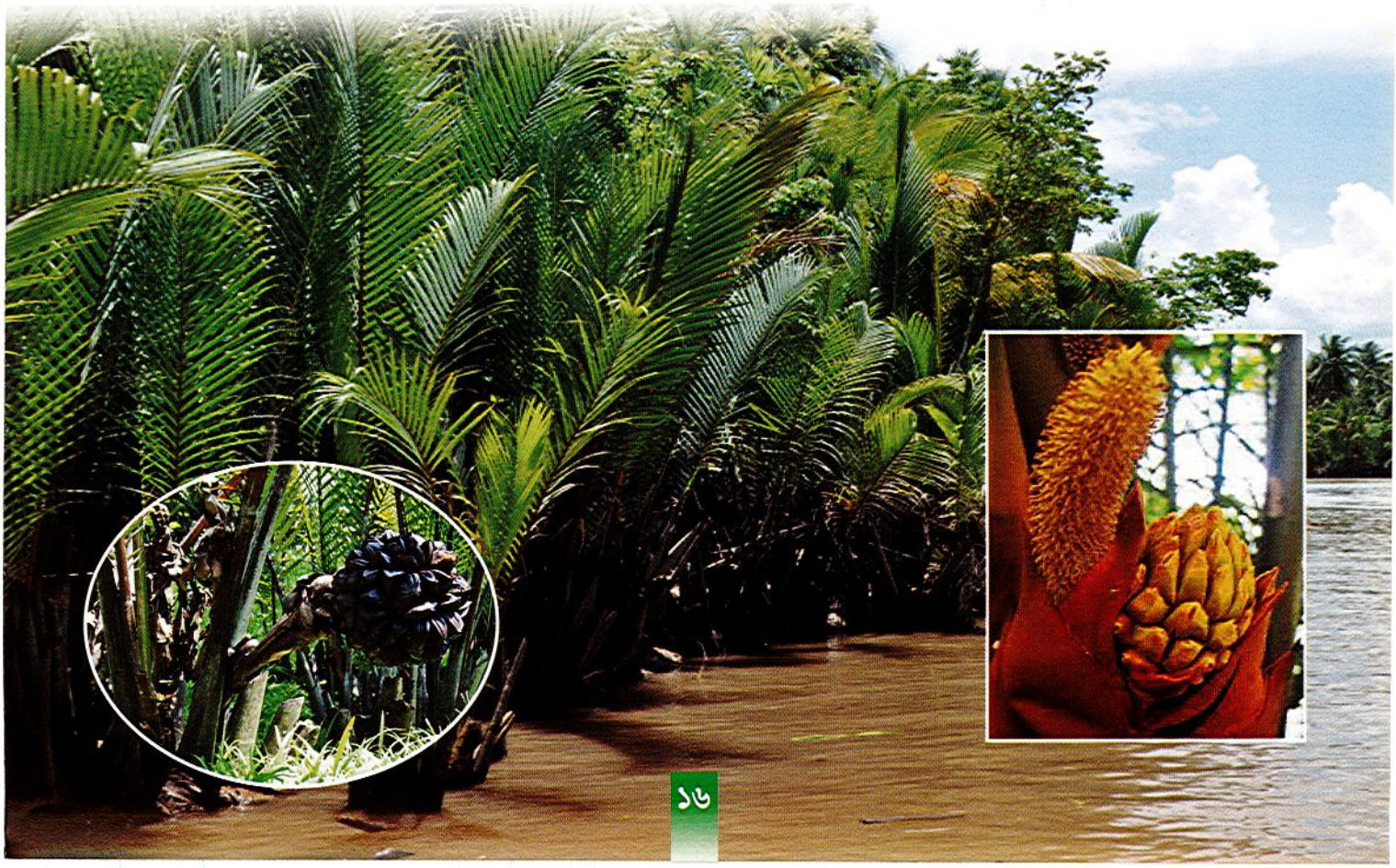

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

গোলপাতা গাছের গোড়ার চারপাশে মুথা থেকে প্রতিনিয়ত চারা জন্মায়। এছাড়া গোলপাতার বীজ ভেসে ভেসে বনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং নদী, খাল ও নালার কিনারার কাদা মাটিতে বীজ আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে বীজ সংগ্রহ করে নার্সারিতে পলিথিন ব্যাগে চারা উৎপাদন করা যায়। উপকূলীয় বনায়নে চর এলাকার নরম মাটিতে গোলপাতার চারা লাগানো হয়ে থাকে। চারা রোপণের ৫ বছর পর গোলপাতার গাছ বয়স্ক হয় এবং ফুল-ফল ধরে।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

গোলপাতা সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকার একটি গৌণ বনজ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। মূলত গোলপাতা গাছের পাতার ব্যবহার বেশি। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় ও দক্ষিণ অঞ্চলের অনেকে গোলপাতা দিয়ে বসত ঘর, রান্না ঘর ও গোয়াল ঘরের ছাউনি এবং অনেকে রান্না ঘরের বেড়াসহ বসত বাড়ির চারপাশে আওলি বেড়া (স্থানীয় নাম) নির্মাণ করে থাকে। গোলপাতার ব্যবহার ছাড়া অন্যান্য বহুবিদ ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে-

* অনেক দেশে গোলপাতার কচি পাতা দিয়ে সিগারেট মোড়ক/আবরণ তৈরি করে থাকে।
* গোলপাতা দিয়ে ঝুড়ি বানানো হয়।
* গোলপাতা দিয়ে ছাতার বিকল্প হিসেবে ৩-৪ ফুট লম্বাটে চ্যাপ্টা ও সম্মুখভাগ ত্রিকোণাকৃতির ঝোমড়া তৈরি করা হয়। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকাসহ দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকেরা তীব্র রোদে এবং বর্ষাকালে মাঠে কাজ করার সময় এ ঝোমড়া পিঠে লাগিয়ে ব্যবহার করে থাকে।
* পাতার শক্ত মধ্য শিরা দিয়ে শলার ঝাড়ু বানানো হয়।
* গোলপাতার পুষ্পদন্ডে বীজ হওয়ার আগে তাল গাছের মতো পুষ্পদন্ড কেটে রস সংগ্রহ করে এলকোহল জাতীয় পানীয়, ভিনিগার, তরল জ্বালানি এবং চিনি তৈরি করা হয়। উপকূলীয় এলাকায় সংগৃহীত রস দিয়ে গুড় বানানো হয়। গোলপাতার রসে ভেষজ গুণাগুণ থাকায় জীবাণুনাশক ও চর্মরোগের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
* গোলপাতার কচি ফলের শাঁস তালের শাঁসের মতো নরম, সুস্বাদু ও ভক্ষণীয়। সুন্দরবনে কর্মরত বনজীবীরা এ শাঁস খেয়ে থাকে।
* কৃমিনাশক হিসেবে অনেকে গোলপাতার ফলের শাঁস ও রস খেয়ে থাকে।
* শিকড় আগুনে পুড়িয়ে দাঁতের মাজন তৈরি করা হয়।
* শুকনা পাতা ও পাতার গোড়ার স্ফীত অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ধুন্দুল

বাংলা ও স্থানীয় নাম: ধুন্দুল, ধুন্দাল, ধুতল (সুন্দরবন), কারামফলা, কারামবলা (চকোরিয়া সুন্দরবন), কাম্পা ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Xylocarpus granatum*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের তীব্র লবণাক্ত এলাকায় নদী ও খালের পাড় ঘেঁষে প্রাকৃতিকভাবে ধুন্দুল গাছ জন্মাতে দেখা যায়। এটি এক সময় কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলায় অবস্থিত চকোরিয়া সুন্দরবনে ছিল। উপকূলীয় বন এলাকায় লাগানো ধুন্দুল গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ

ধুন্দুল ছোট থেকে মধ্যম আকৃতির কম ডালপালাযুক্ত চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ১০-১২ মিটার এবং গাছের বেড় ৩০-৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়ার চারপাশে কাদা মাটিতে খাটো শক্ত চ্যাপ্টা আকৃতির শ্বাসমূল এবং গাছের গোড়াতে চ্যাপ্টা প্রসারিত ঠেসমূল (buttress) রয়েছে। প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা, গোলাকার। বাকল মসৃণ, পুরু, সাদাটে বা হলুদাভ বাদামি বর্ণের। পাতা যৌগিক এবং ২-৪ জোড়া পত্রযুক্ত এবং পত্রকগুলো উপবৃত্তকার, পুরু, কিনারা মসৃণ ও আগা গোলাকার। এপ্রিল-মে মাসে ছোট আকারের পাটল হলুদাভ বর্ণের ফুল ফোটে। ফল পুরু আবরণযুক্ত বৃহৎ গোলাকার ১৫-২৫ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত, গড় ওজন ২.৫-৩.০ কেজি এবং সর্বোচ্চ ৭ কেজি পর্যন্ত হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পরিপক্ক ফল গাঢ় বাদামি বর্ণের হয়। প্রতিটি ফলে মাংসল ত্রিকোণাকার বিশিষ্ট গাঢ় বাদামি বর্ণের ৮-১০টি করে বীজ থাকে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

বন এলাকায় ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পরিপক্ক ফল আপনা-আপনি ফেটে গিয়ে বীজগুলো লবণাক্ত পানিতে পড়ে ভাসতে থাকে এবং নদী ও খালের পাড় ঘেঁষে কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে ধুন্দুল চারা জন্মায়। এ ছাড়া নার্সারিতে পলিথিন ব্যাগে বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়। চারা গাছের পাতা হরিণের প্রিয় খাবার হওয়ায় সুন্দরবন ও উপকূলীয় বনে প্রাকৃতিকভাবে চারা থেকে বড় গাছে পরিণত হতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া বয়স্ক মাতৃ গাছের অপ্রতুলতার কারণে বীজের তেমন সরবরাহ নেই।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

কাঠ উন্নত মানের, লালচে বাদামি বর্ণের, বেশ মজবুত, টেকসই এবং হালকা ধরনের। সৌখিন আসবাবপত্র, ঘরের দরজা-জানালার ফ্রেম, কাঠ পেন্সিল, ভিনিয়ার, মধ্যম মানের কয়লা ও জলযান নির্মাণের কাজে কাঠ ব্যবহার করা হয়। ট্যানিন কাজে বীজ ব্যবহৃত হয়। ট্যানিন কাজে বীজ ব্যবহৃত হয়।

পশুর

বাংলা ও স্থানীয় নাম: পশুর, পুশুর (সুন্দরবন), আইল (চকোরিয়া সুন্দরবন) ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Xylocarpus moluccensis*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনে বিক্ষিপ্তভাবে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো পশুর গাছ দেখা যায়। অবৈধভাবে অতিরিক্ত আহরণের ফলে বর্তমানে এ প্রজাতির অস্তিত্ব হুমকিগ্রস্থ। এটি এক সময় কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলায় অবস্থিত চকোরিয়া সুন্দরবনে ছিল। উপকূলীয় বন এলাকায় লাগানো পশুর গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ

পশুর মাঝারি আকৃতির ডালপালাযুক্ত পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ১০-২০ মিটার এবং গাছের বেড় ৫০-১০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়ার চারপাশে কাদা মাটিতে লম্বাটে শক্ত চ্যাপ্টা আকৃতির শ্বাসমূল রয়েছে। প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা, গোলাকার। বাকল অমসৃণ, পুরু ও ছাই ধূসর বা কালচে বর্ণের। পাতা যৌগিক এবং ২-৪ জোড়া পত্রকযুক্ত। পত্রকগুলো আয়তাকার, কিনারা মসৃণ ও আগা সূচালো। এপ্রিল-মে মাসে ছোট আকারের পাটল হলুদাভ বর্ণের ফুল ফোটে। ফল গোলাকার ও শক্ত পুরু আবরণযুক্ত। জুন-জুলাই মাসে পরিপক্ক ফল হালকা সবুজাভ-হলুদ বর্ণের হয়। প্রতিটি ফলে মাংসল ত্রিকোণাকার বিশিষ্ট গাঢ় বাদামি বর্ণের ৮-১২টি করে বীজ থাকে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

বন এলাকায় জুন-জুলাই মাসে পরিপক্ক ফল আপনা-আপনি ফেটে গিয়ে বীজগুলো লবণাক্ত পানিতে পড়ে ভাসতে থাকে এবং নদী ও খালের পাড় ঘেঁষে কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। এ ছাড়া নার্সারিতে পলিথিন ব্যাগে বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়। পশুর চারার পাতা হরিণের প্রিয় খাবার হওয়ায় সুন্দরবন ও উপকূলীয় বনে প্রাকৃতিকভাবে চারা থেকে বড় গাছে পরিণত হতে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া বয়স্ক মাতৃ গাছের অপ্রতুলতার কারণে পশুর বীজের তেমন সরবরাহ নেই।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

কাঠ গাড় লাল বা কালচে বর্ণের, উন্নত মানের, বেশ ভারী, মজবুত ও টেকসই। আসবাবপত্র, গৃহ ও জলযান নির্মাণের কাজে কাঠ ব্যবহৃত হয়। বীজ থেকে "চাপা তেল" নামক তেল পাওয়া যায় যা সাবান তৈরিতে, আলো জ্বালাতে ও চুলে ব্যবহার করা হয়।

বাইন বা কালা বাইন

বাংলা ও স্থানীয় নাম: কালা বাইন (সুন্দরবন), বড় বাইন (চকোরিয়া সুন্দরবন), বল বাইন (টেকনাফ), তেয়ান বাইন, তিয়ান বাইন ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Avicennia officinalis*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

কালা বাইন একটি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছ। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের তীব্র লবণাক্ত অঞ্চলের খালের কিনারা ও নদ-নদীর তীর এবং তীর বেষ্টিত নিচু জায়গায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো কালা বাইনের গাছ দেখা যায়। উপকূলীয় বন সৃষ্টিতে কেওড়া প্রজাতির পর কালা বাইন দ্বিতীয় প্রজাতি হিসেবে লাগানো হয়। এ ছাড়া কক্সবাজারের টেকনাফ ও চকোরিয়া সুন্দরবনে কালা বাইন গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ

কালা বাইন মাঝারি আকৃতির প্রশস্ত ডালপালাযুক্ত চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ১০-১৬ বা সর্বোচ্চ ২৫ মিটার এবং গাছের বেড় ৫০-১০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়ার কাদা মাটিতে আঙ্গুলের মতো সরু লম্বাটে শ্বাসমূল রয়েছে এবং প্রধান কাণ্ডে বায়বীয় শিকড় গজাতে দেখা যায়। প্রধান কাণ্ড গোলাকার খাটো আঁকাবাঁকা। বাকল মসৃণ, পুরু ও কালচে ধূসর বা হলুদাভ সবুজ বর্ণের। পাতা ডিম্বাকার, কিনারা মসৃণ ও আগা ভোঁতা। জুন-জুলাই মাসে ডালপালার শেষপ্রান্তে ত্রিশাখা বিশিষ্ট পুষ্পবিন্যাসে গুচ্ছাকারে ছোট আকৃতির কমলা-হলুদ বর্ণের মিষ্টি ঘ্রাণ ও মধুযুক্ত ফুল ফোটে। ফলগুলো হৃদপিন্ডাকার, স্থায়ী বৃতিযুক্ত ও প্রান্তভাগ সূচালো। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পরিপক্ক ফল সবুজাভ হলুদ বর্ণের হয়। ফলগুলো একক বীজ বিশিষ্ট।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

বন এলাকায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পরিপক্ক বীজগুলো লবণাক্ত পানিতে পড়ে ভাসতে থাকে এবং বনের কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। এ ছাড়া নার্সারিতে পলিথিন ব্যাগে বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়। উপকূলীয় বনায়নে বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই মাসে এক বছর বয়সের কালা বাইনের চারা লাগানো হয়। কালা বাইন গাছ কপিচিং (coppicing) ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থাৎ কর্তনকৃত গাছের গোড়া বা মুথা থেকে প্রাকৃতিকভাবে একাধিক কুশি/চারা জন্মায় যা পরবর্তীতে বড় গাছে পরিণত হয়।

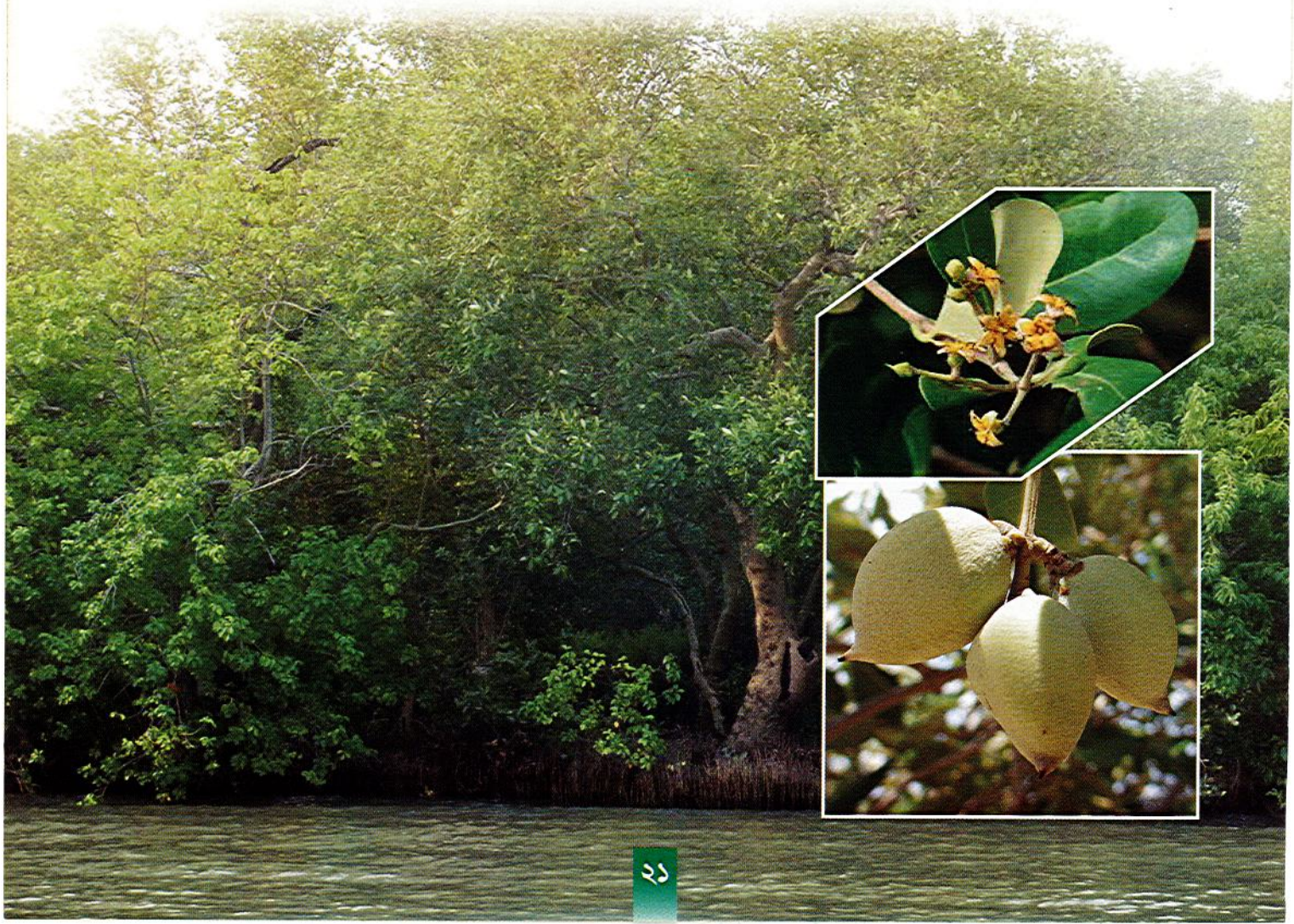

গুরুত্ব ও ব্যবহার

কালা বাইনের সার ও অসার কাঠ দেখতে একই রকম, ধূসর বর্ণ, নিম্ন মানের, ভঙ্গুর, মোটা আঁশযুক্ত, মধ্যম ভারী ও কম টেকসই। অধিকাংশ বয়স্ক গাছের প্রধান কাণ্ডের ভিতর পচে গর্ত সৃষ্টি হওয়ায় কাঠ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কাঠ প্রধানত জ্বালানি হিসেবে, নৌকা, গৃহ, ব্রিজ, প্লাইউড ও কাগজ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। পাতা ও ফল হরিণসহ গবাদি পশুর প্রিয় খাদ্য। ফুল থেকে মধু পাওয়া যায়।

সুন্দরী

বাংলা ও স্থানীয় নাম: সুন্দরী, সুন্দার ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Heritiera fomes*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

সুন্দরী একটি প্রকৃত ম্যানগ্রোভ স্রোতজ প্রজাতি (littoral species) এবং উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনের সর্বশেষ ধাপের বা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রজাতি (climax species)। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের সব অঞ্চলে সুন্দরী গাছের বিস্তৃতি রয়েছে এবং সুন্দরবনে সুন্দরী গাছের প্রধান্য ও বিস্তৃতি বেশি (প্রায় ৬৪ ভাগ)। সুন্দরবনের কম ও মধ্যম লবণাক্ত এলাকায় সুন্দরী গাছের বৃদ্ধি ভালো। তবে সুন্দরবনের তীব্র লবণাক্ত এলাকায় গাছের বিস্তৃতি কম এবং তুলনামূলকভাবে গাছের বৃদ্ধিও কম। এটি কক্সবাজারের চকোরিয়া সুন্দরবনে কদাচিৎ দেখা যায়। এ ছাড়া উপকূলীয় বন এলাকায় লাগানো সুন্দরী গাছের বিস্তৃতি রয়েছে।

গাছের বিবরণ

সুন্দরী মাঝারি থেকে বড় আকৃতির ডালপালাযুক্ত চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ১৫-২৫ মিটার এবং গাছের বেড় ২০-৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়াতে ঠেসমূল এবং গাছের চারপাশে কাদা মাটিতে মোটা শক্ত গোঁজ ধরনের শ্বাসমূল রয়েছে। প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা ও গোলাকার। বাকল পুরু, অমসৃণ ও গাঢ় ধূসর বর্ণের। পাতা আয়তাকার, কিনারা মসৃণ ও আগা সূচালো। মার্চ-এপ্রিল মাসে ডালপালার মাথায় লম্বা পুষ্পবিন্যাসে কমলা বা লালচে-বাদামি বর্ণের ছোট আকারের পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ফোটে। ডালপালার মাথায় গুচ্ছাকারে সবুজ বর্ণের ফল ধরে। ফল ডিম্বাকার বা নৌকা আকৃতির এবং পৃষ্ঠভাগে লম্বালম্বিভাবে ২-৩টি শিরাযুক্ত। জুন-জুলাই মাসে পরিপক্ক ফল বাদামি বর্ণের হয়। প্রতিটি ফলে ১টি করে গোলাকার বীজ থাকে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

বন এলাকায় জুন-জুলাই মাসে পরিপক্ক ফল গাছ থেকে ঝরে পড়ে লবণাক্ত পানিতে ভাসতে থাকে এবং ফলগুলো বনের কাদা মাটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। এ ছাড়া নার্সারিতে পলিথিন ব্যাগে বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়। উপকূলীয় বনায়নে বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই মাসে এক বছর বয়সী সুন্দরীর চারা লাগানো হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

অসার কাঠ হালকা লালচে-ধূসর বর্ণের এবং সার কাঠ গাঢ় লালচে-বাদামি বর্ণের, বেশ শক্ত, ভারী, মজবুত ও টেকসই। কাঠ দিয়ে দেশিয় নৌকাসহ অন্যান্য জলযান, কাঠের ব্রিজ, আসবাবপত্র, প্যানেলিং ও গৃহ নির্মাণে এবং বৈদ্যুতিক খুঁটি হিসেবে লগ ব্যবহার করা হয়। ভালো জ্বালানি হিসেবে ও উন্নত কয়লা এবং হার্ডবোর্ড তৈরিতে ডালপালা ব্যবহার করা হয়। বাকল থেকে ট্যানিন ও রং পাওয়া যায়।

সুন্দরী গাছের অস্তিত্বমূলক অবস্থা

মিঠা পানির প্রবাহ হ্রাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং সুন্দরী গাছের গোড়াতে ব্যাপকহারে পলি মাটি জমে শ্বাসমূল বা নিউম্যাটোফোর এর স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়াতে এ গাছে আগামরা রোগ দেখা দিয়েছে। ধারণা করা হয় যে, ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের ৩৮ শতাংশ সুন্দরী গাছ আগামরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে।

সমুদ্র উপকূলীয় জনপদ এলাকায় লাগানো গাছপালার পরিচিতিমূলক বিবরণ

আকাশমনি

বাংলা ও স্থানীয় নাম: আকাশমনি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Acacia auriculiformis*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশে আকাশমনি একটি বিদেশি (exotic) প্রজাতির গাছ। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৩ সালে অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও পাপুয়া নিউ গিনি থেকে বীজ সংগ্রহ পূর্বক চারা করে মাঠ পর্যায়ের গবেষণা কেন্দ্রসমূহের বনাঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে লাগানো হয়। বর্তমানে দেশব্যাপী লাগানো আকাশমনি গাছের প্রচুর বিস্তৃতি ঘটেছে। আকাশমনি গাছ অনুর্বর মাটিতে, কম লবণাক্ত বা সাময়িক জলাবদ্ধ জায়গাতেও জন্মায়।

গাছের বিবরণ

আকাশমনি মধ্যম আকৃতির প্রচুর শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ১২-১৮ মিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কাণ্ড খাটো, আঁকাবাঁকা এবং গোড়ার অংশে একাধিক খাঁজযুক্ত। বাকল পুরু ও গাঢ় বাদামি বা কালো ধূসর বর্ণের। পাতা ফাইলোড (Phyllode) ধরনের, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। বছরে দু'বার জুন-আগস্ট ও অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে সোনালী বর্ণের ফুল ফোটে। ফল শিম জাতীয়, বাঁকানো প্যাঁচানো বা জড়ানো ধরনের। পরিপক্ক ফল ধূসর বা তামাটে বর্ণের হয়। বীজগুলো আকারে ছোট ও চ্যাপ্টা এবং বাদামি কালো বর্ণের। বীজের নাভির সাথে হলুদ বর্ণের সূতার মতো অংশ সংযুক্ত থাকে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

বন এলাকায় বীজ থেকে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। এ ছাড়া ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নার্সারিতে পলিথিন ব্যাগে বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়। বপনের পূর্বে বীজ ফুটন্ত গরম পানিতে ৩০-৪০ সেকেন্ড সময় এবং পরে ঠান্ডা পানিতে ১০-১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে বপন করলে অঙ্কুরোদগমের হার অধিক পাওয়া যায়। বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই মাসে এক বছর বয়সী আকাশমনির চারা লাগানো হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

অসার কাঠ হালকা সাদাটে এবং সার কাঠ গাঢ় বাদামি বর্ণের, ভারী, বেশ মজবুত ও টেকসই। আকাশমনি কাঠের সাথে সেগুন কাঠের সাদৃশ্য রয়েছে এবং কাঠের মাঝে লম্বা লম্বা টানা রেখার দাগ আছে। আসবাবপত্র, জ্বালানি ও কয়লা তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। আকাশমনি বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন সংবদ্ধকারী গাছ হিসেবে পরিচিত। শিকড়ে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন সংবদ্ধ করে মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে।

কালোজাম

বাংলা ও স্থানীয় নাম: জাম, কালোজাম, কালাজাম, ছাকু, সাব্রি (মগ) ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Syzygium cumini*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে কালোজাম গাছে বুনো অবস্থায় দেখা যায়। কালোজাম দেশব্যাপী প্রায় এলাকার পুকুর পাড়ে ও বসত বাড়িতে খাওয়ার ফল গাছ হিসেবে এবং রাস্তার পাশে এভিনিউ ও ছায়া বৃক্ষ হিসেবে লাগানো হয়।

গাছের বিবরণ

কালোজাম বড় আকৃতির এবং ডালপালা বিশিষ্ট চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ১৫-২৫ মিটার এবং গাছের বেড় ২ মিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কান্ড সরল, সোজা, গোলাকার এবং বাকল পুরু, মসৃণ এবং ধূসর বর্ণের। পাতা আয়তাকার, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। মার্চ-এপ্রিল মাসে ত্রিশাখান্বিত পুষ্পবিন্যাসে থোকায় থোকায় সুমিষ্টি ঘ্রাণবিশিষ্ট ছোট সবুজ-সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফল ডিম্বাকৃতি এবং গাছে থোকায় থোকায় ধরে। জুন-জুলাই মাসে পরিপক্ক ফলগুলো বেগুনি বা কালো বর্ণের হয়। পাকা ফলের আবরণ পাতলা এবং আবরণের নিচের নরম অংশ মাংসল, রসালো ও সুমিষ্ট যা খাওয়ার উপযোগী। ফল একক বীজ বিশিষ্ট।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

বন এলাকায় বীজ থেকে প্রাকৃতিকভাবে চারা জন্মায়। এ ছাড়া জুন-জুলাই মাসে নার্সারিতে পলিথিন ব্যাগে কালোজামের বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়। সংগৃহীত পাকা ফল চটকিয়ে বীজ বের করা হয়। এ ছাড়া ফল খাওয়ার পর ফেলে দেয়া বীজ সংগ্রহ করে পলিথিন ব্যাগে বপন করতে হয়। বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই মাসে এক বছর বয়সের কালোজামের চারা লাগানো হয়। সড়ক বনায়ন, পার্ক ও বসত বাড়িতে শোভাবর্ধন ও ছায়া বৃক্ষ হিসেবে এবং খাওয়ার ফলদ গাছ হিসেবে চারা লাগানো হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

কাঠ লালচে-ধূসর থেকে বাদামি-ধূসর বর্ণের, মাঝারি শক্ত ও ভারী। গৃহ নির্মাণে খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম, রুয়া, পাইড়, কৃষি সরঞ্জাম, চেয়ার-টেবিলের পায়া ও ফ্রেম, সেতু তৈরিতে এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা হয়। পাকা রসালো ফল মানুষ, বাদুর, কাঠবিড়ালি ও অন্যান্য পশু-পাখিরা খেয়ে থাকে। বীজ ভেষজ গুণাগুণ সম্পন্ন। ফুল মৌমাছিদের জন্য মধুর উৎস।

● খৈ-বাবলা বা খৈয়া বাবলা

বাংলা ও স্থানীয় নাম: খৈ-বাবলা, খৈয়া বাবলা, জিলাপি (রাজশাহী), বিলাতি আমলি, দেখনি বাবুল ইত্যাদি। খৈ-বাবলার ফল/পডগুলো জিলাপির মতো প্যাঁচানো বিধায় এ গাছ জিলাপি নামে অভিহিত।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Pithecellobium dulce*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

খৈ-বাবলা গাছের আদি নিবাস হচ্ছে উষ্ণমণ্ডলীয় আমেরিকা। এটি বিদেশ থেকে এনে আমাদের দেশে প্রবর্তন করা হয়। রাস্তার পাশে এভিনিউ গাছ হিসেবে এবং জমির সীমানাতে ও বাগানের বেড়াতে ঝোপালো গাছরূপে লাগানো হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষ করে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জেলাগুলোতে এবং রাজশাহীতে লাগানো খৈ-বাবলা গাছের বিস্তৃতি রয়েছে।

গাছের বিবরণ

খৈ-বাবলা ছোট থেকে মাঝারি আকৃতির দ্রুত বর্ধনশীল চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ১৫-২০ মিটার এবং গাছের বেড় ৫০-১০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কাণ্ড খাটো গোলাকার এবং শাখা কাণ্ড ও ডালপালাতে খাটো আকৃতির তীক্ষ্ম কাঁটা রয়েছে। বাকল পুরু, অমসৃণ ও সবুজাভ-ধূসর বর্ণের। পাতা যৌগিক ধরনের ১ জোড়া পিনাযুক্ত এবং প্রতি পিনাতে পত্রক সংখ্যা ১ জোড়া। পত্রকগুলো আয়তাকার, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। পাতার গোড়াতে খাটো আকৃতির ২টি করে তীক্ষ্ম কাঁটা রয়েছে। গজানো নতুন পাতা লালচে বর্ণের হয়। পাতার কক্ষে লম্বা পুষ্পবিন্যাসে গুচ্ছাকারে সবুজাভ-সাদা বর্ণের হালকা ঘ্রাণযুক্ত ছোট আকৃতির ফুল ফোটে। ফল পড জাতীয় দেখতে শিমের মতো, তবে জিলাপির মতো ১ থেকে ৩ টি প্যাঁচানো রিংযুক্ত। পরিপক্ক ফল/পড উজ্জ্বল লাল বর্ণের হয়। প্রতিটি ফল/পডে ৮-১২টি করে বীজ রয়েছে। বীজগুলো কালো বর্ণের চ্যাপ্টা ডিম্বাকার এবং সাদা বর্ণের স্পঞ্জি মাংসল পাল্প দ্বারা আবৃত থাকে।

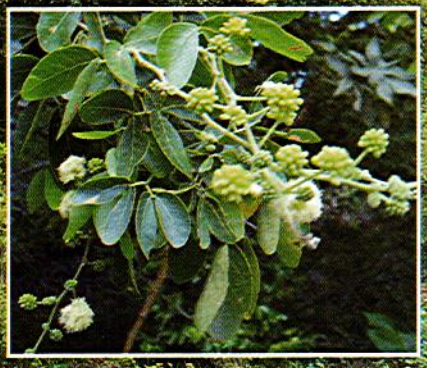

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

প্রাকৃতিকভাবে গাছের তলাতে বীজ থেকে চারা ও গাছ জন্মায়। নার্সারিতে সংগৃহীত বীজ পলিথিন ব্যাগে বপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। বপনের পূর্বে বীজ ফুটন্ত গরম পানিতে ১ মিনিট সময় চুবিয়ে এবং পরে ২৪ ঘণ্টা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে বপন করলে অঙ্কুরোদগমের হার অধিক পাওয়া যায়। বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই মাসে এক বছর বয়সের খৈ-বাবলার চারা লাগানো হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

খৈ-বাবলা গাছের অসার কাঠ হলুদাভ এবং সার কাঠ লালচে-বাদামি বর্ণের। কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতা গবাদিপশুর প্রিয় খাদ্য। পাকা ফলের মধ্যকার বীজগুলোর আবৃত সাদা বর্ণের মাংসল মিষ্ট ও হালকা টক স্বাদযুক্ত স্পঞ্জি পাল্প ভক্ষণীয় যা মানুষ ও পাখিরা খেয়ে থাকে। বাকল থেকে ট্যানিন ও হলুদ বর্ণের রং পাওয়া যায়। গাছ থেকে নির্গত গাঢ় লাল স্বচ্ছ গাম আঠা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাকল ও পাতার নির্যাস আমাশয়, ডায়রিয়া, যক্ষ্মা ও গল নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়।

পূন্যাল বা পনিয়াল

বাংলা ও স্থানীয় নাম: পূন্যাল, পনিয়াল (নোয়াখালী), গোলাব (বরিশাল ও সুন্দরবন) ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Calophyllum inophyllum*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

পূন্যাল গাছ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও অন্যান্য স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে জন্মাতে দেখা যায়। সুন্দরবনের পূর্বাঞ্চলের কম লবণাক্ত এলাকায় কিছু পূন্যাল গাছ দেখা যায়। পূন্যাল অলংকারিক বা শোভাবর্ধনকারী গাছ হিসেবে বাগান ও পার্কসমূহে লাগানো হয়। ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের ৫০নং সেকশনে লাগানো কিছু পূন্যাল গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ

পূন্যাল মধ্যম আকৃতির ডালপালা বিশিষ্ট চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ১২-১৫ মিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা ও নলাকার। বাকল পুরু ও কালচে বাদামি বর্ণের এবং বাকলে রয়েছে দুধের মতো সাদা বা হলুদাভ-সাদা কষ। পাতা পুরু, উপবৃত্তাকার, কিনারা মসৃণ এবং আগা গোলাকার। এপ্রিল-মে মাসে লম্বা পুষ্পবিন্যাসে থোকায় থোকায় সুঘ্রাণ বিশিষ্ট সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফল গোলাকার এবং থোকায় থোকায় ধরে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে পরিপক্ক ফল বাদামী বর্ণের হয়। প্রতিটি ফল একক বীজ বিশিষ্ট। বীজ গোলাকার, বাদামি বর্ণ, বহিরাবরণ শক্ত এবং ভিতরে তেলযুক্ত গোলাকার সাদা শাঁস রয়েছে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

প্রাকৃতিকভাবে গাছের তলাতে বীজ থেকে চারা ও গাছ জন্মায়। নার্সারিতে সংগৃহীত বীজ পলিথিন ব্যাগে বপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই মাসে এক বছর বয়সের পূন্যাল চারা লাগানো হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

কাঠ হালকা বাদামী বর্ণের, বেশ শক্ত, মজবুত ও টেকসই। ঘরের খুঁটি, জলযান নির্মাণে ও ক্যাবিনেট তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। গাছের রেজিনাস গাম ঔষধ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বীজ শাঁস থেকে সংগৃহীত তেল প্রদীপ জ্বালাতে এবং বাতজ্বর ও চর্ম রোগ নিরাময়ে ব্যবহার করা হয়।

● মেহগনি বা বড় মেহগনি

বাংলা ও স্থানীয় নাম: মেহগনি, বড় মেহগনি, মেহগিনি ইত্যাদি। এ প্রজাতি মেহগনির পাতার আকৃতি বড় হওয়ায় একে বড় মেহগনি বলা হয়।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Swietenia macrophylla*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

বড় মেহগনির গাছ সারা দেশব্যাপী প্রচুর সংখ্যায় বিস্তৃত এবং এভিনিউ গাছ হিসেবে রাস্তার পাশে ব্যাপকহারে লাগানো হচ্ছে। মেহগনি বিদেশি গাছ হলেও আমাদের দেশের উর্বর পলিযুক্ত দোআঁশ আর্দ্র মাটি ও জলবায়ুতে ভালোভাবে জন্মাচ্ছে। পাহাড়ি বন এলাকাসহ সমতল এলাকার রাস্তা ও রেল লাইনের পাশে, খাল-নদী ও পুকুর পাড়ে, বসত বাড়ির খোলা আঙ্গিনায় এবং উপকূলীয় এলাকার বেড়ি বাঁধসহ উঁচু স্থানে লাগানো বড় মেহগনির বিস্তৃতি রয়েছে।

গাছের বিবরণ

বড় মেহগনি বৃহৎ আকৃতির এবং ডালপালা বিশিষ্ট পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩০-৩৫ মিটার এবং গাছের বেড় প্রায় ২ মিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা, গোলাকার এবং প্রায় ১০-২০ মিটার পর্যন্ত, প্রধান কাণ্ডে কোন ডালপালা থাকে না। বাকল অমসৃণ ও ধূসর বাদামি বর্ণের। পাতা যৌগিক এবং পত্রক সংখ্যা ৬-১৬টি। পাতার কিনারা মসৃণ ও আগা সূচালো। শীতের শেষভাগে ফেব্রুয়ারি মাসে পাতা ঝরে পড়ে এবং নতুন পাতা গজায়। মার্চ-এপ্রিল মাসে সবুজাভ হলুদ বর্ণের ফুল ফোটে। ফল ক্যাপসুল, কাষ্ঠল, দেখতে অনেকটা আতা ফলের মতো। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে পরিপক্ক ফল বাদামি বর্ণের হয়। প্রতিটি ফলে ৫টি প্রকোষ্ঠ এবং অসংখ্য বীজ থাকে। বীজগুলো পাতলা চ্যাপ্টা খয়েরি বর্ণের এবং বীজের উপরিভাগে সংযুক্ত পাতলা পাখনা রয়েছে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

সাধারণত বীজজাত চারা দিয়ে বংশ বিস্তার হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে সংগৃহীত পরিপক্ক ফল রোদে শুকালে আপনা-আপনি ফেটে গিয়ে পাতলা পাখনাযুক্ত বীজগুলো বের হয়ে আসে। বীজগুলো ছায়াযুক্ত জায়গায় ছড়িয়ে শুকাতে হবে। বীজের আয়ুষ্কাল কম বিধায় দ্রুত সময়ের মধ্যে বীজ পলিথিন ব্যাগে বপন করতে হয়। চারা গজানো বা অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা প্রায় ৬০- ৭০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ৭-১০ দিন। বর্ষার শুরুতে জুন-জুলাই মাসে এক বছর বয়সের বড় মেহগনির চারা লাগানো হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

কাঠ লালচে ধূসর বর্ণের, বেশ শক্ত, মজবুত ও টেকসই। সৌখিন আসবাবপত্র ও গৃহ নির্মাণে দরজা-জানালার ফ্রেমসহ পাল্লা তৈরিতে কাঠ ব্যবহার করা হয়। বীজ থেকে কীটনাশক ও সার তৈরি হয়। বীজ থেকে বানানো তেল পোকামাকড়, পিঁপড়া ও উঁইপোকা দমনে এবং বীজের গুঁড়া জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতার নির্যাস থেকে তৈরি পানীয় ভেষজ জ্বর ও টাইফয়েড নিরাময় করে। দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসীরা মাথার উকুন দূর করতে বীজের তেল ব্যবহার করে।

রাজকড়ই বা চাম্বল

বাংলা ও স্থানীয় নাম: রাজকড়ই, গগন শিরিষ, চাম্বল (বরিশাল) ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Albizia richardiana*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

রাজকড়ই গাছের আদি নিবাস আফ্রিকার মাদাগাস্কার। এটি বিদেশ থেকে এনে আমাদের দেশে ১৯ দশকের শেষভাগে প্রবর্তন পূর্বক এভিনিউ গাছ হিসেবে রাস্তার পাশে লাগানো হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলের বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও বাগেরহাট জেলাগুলোতে শোভাবর্ধনকারী ও এভিনিউ হিসেবে লাগানো রাজকড়ই গাছের বিস্তৃতি রয়েছে। গ্রামগঞ্জে, শহরে, বসত বাড়িতে, রাস্তার পাশে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও বিনোদনমূলক পার্কে লাগানো রাজকড়ই গাছ দেখা যায়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন চত্বরে লাগানো কিছু বয়স্ক রাজকড়ই গাছ রয়েছে।

গাছের বিবরণ

রাজকড়ই বড় আকৃতির সুউচ্চ দ্রুত বর্ধনশীল চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩০-৩৫ মিটার এবং বুক সমান উচ্চতায় গাছের বেড় ৪০-১০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কাণ্ড খাটো, গোলাকার এবং গাছের ডালপালাগুলো উর্ধমুখীভাবে পর্যায়ক্রমে দ্বি-বিভাজিতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং গাছের মাথায় ডালপালাগুলোর বিস্তৃতি ছাতার মতো মুকুট (crown) আকৃতির। বাকল পুরু, কিছুটা অমসৃণ এবং হলুদাভ-ধূসর বর্ণের। পাতা যৌগিক, ছোট উপপত্রযুক্ত এবং পিনার সংখ্যা ৮-১৪ জোড়া। প্রতিটি পিনাতে পত্রক সংখ্যা ৬০-১০০ জোড়া। পত্রকগুলো আকারে খুবই ছোট, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে লম্বা শাখান্বিত পুষ্পবিন্যাসে গুচ্ছাকারে ঘ্রাণযুক্ত সবুজাভ-সাদা বর্ণের ছোট আকৃতির অসংখ্য ফুল ফোটে। ফল পড জাতীয় দেখতে শিমের মতো পাতলা চ্যাপ্টা ধরনের। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পরিপক্ক ফল/পড হালকা ধূসর-বাদামি বর্ণের। প্রতিটি ফল/পডে ৮-১২টি করে বীজ থাকে। বীজগুলো ছোট, ডিম্বাকার, চ্যাপ্টা ও হালকা বাদামি-ধূসর বর্ণের।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

গাছের তলাতে প্রাকৃতিকভাবে বীজ থেকে চারা ও গাছ জন্মায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সংগৃহীত ফল/পড রোদে ৫-৭ দিন শুকিয়ে লাঠির মৃদু আঘাতে বীজ বের করতে হয়। নার্সারিতে সংগৃহীত বীজ পলিথিন ব্যাগে বপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। বপনের পূর্বে বীজ ফুটন্ত গরম পানিতে ১ মিনিট সময় চুবিয়ে এবং পরে ২৪ ঘণ্টা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে বপন করলে অঙ্কুরোদগমের হার অধিক পাওয়া যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

রাজকড়ই গাছের অসার কাঠ সাদা থেকে হালকা হলুদাভ এবং সার কাঠ সাদাটে বর্ণের। কাঠ মধ্যম শক্ত, মজবুত ও টেকসই। বরিশাল এলাকায় কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি, নিম্ন মানের আসবাবপত্র, গৃহ নির্মাণে, ভিনিয়ার ও কাগজের মণ্ড (পাল্প) এবং ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাতা গবাদিপশুর প্রিয় খাদ্য। রাজকড়ই শোভাবর্ধনকারী এভিনিউ গাছ হিসেবে রাস্তার পাশে ও পার্ক এলাকায় লাগানো হয়।

শিল কড়ই

বাংলা ও স্থানীয় নাম: শিল কড়ই (চট্টগ্রাম), লোহা শিরিষ (সিলেট), জাত কড়ই (উত্তরবঙ্গ), সাদা কড়ই, ছই বা ঘেপা (মগ), খেলভি (গারো) ইত্যাদি।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Albizia procera*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশে শিল কড়ই অপেক্ষাকৃত স্যাঁতসেঁতে ও আর্দ্র জায়গাতে জন্মায়। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটের মিশ্র চিরসবুজ বনাঞ্চলে এবং গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও দিনাজপুরের পাতাঝরা শাল বনের নদীর পাড় ,পানির ছড়া এবং পাহাড়ের ঢালুতে প্রাকৃতিকভাবে শিল কড়ই গাছ জন্মাতে দেখা যায়। এ ছাড়া গ্রামগঞ্জে ও বসত বাড়িতে লাগানো শিল কড়ই গাছ দেখা যায়। ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে লাগানো কিছু শিল কড়ই গাছ রয়েছে।

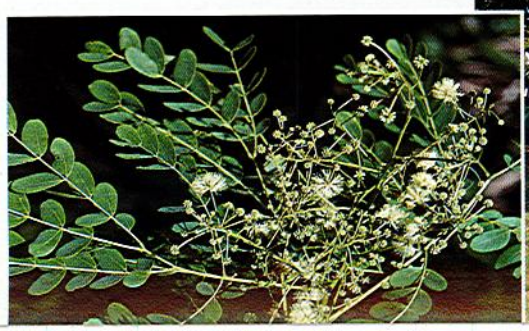

গাছের বিবরণ

শিল কড়ই বড় আকৃতির দ্রুত বর্ধনশীল পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ৩০-৪০ মিটার এবং বুক সমান উচ্চতায় গাছের বেড় ৩৫-৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কাণ্ড সরল, সোজা, নলাকার এবং বাকল পুরু, অমসৃণ ও বাদামি ধূসর বর্ণের। পাতা যৌগিক, ৩-৫ জোড়া নিয়ে পত্রফলক এবং প্রতি পত্রফলকের মধ্যে ৬-১৬ জোড়া ছোট আকৃতির পত্রক রয়েছে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে গুচ্ছাকারে হলুদাভ সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। ফল পড জাতীয় দেখতে শিমের মতো, পাতলা ও চ্যাপ্টা। মার্চ-এপ্রিল মাসে পরিপক্ক ফল লালচে বাদামি বর্ণের হয়। প্রায় দুই মাস পর্যন্ত পাকা শুকনা ফল গাছে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। প্রতিটি ফল ৬-১২টি বীজযুক্ত। বীজ ছোট, গোলাকার, চ্যাপ্টা ও বাদামি বর্ণের।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

সাধারণত বন এলাকায় বীজ থেকে চারা জন্মায় ও বংশ বিস্তার হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে সংগৃহীত ফল রোদে ৫-৭ দিন শুকিয়ে লাঠির মৃদু আঘাতে বীজ বের করতে হয়। নার্সারিতে পলিথিন ব্যাগে সংগৃহীত বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। বপনের পূর্বে বীজ ফুটন্ত গরম পানিতে ৩০-৪০ সেকেন্ড সময় চুবিয়ে পরে ২৪ ঘণ্টা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে বপন করলে অঙ্কুরোদগমের হার অধিক পাওয়া যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

শিল কড়ইর অসার কাঠ সাদাটে, তবে সার কাঠ লালচে বাদামি বর্ণের। কাঠ বেশ শক্ত, মজবুত ও টেকসই। কাঠ দিয়ে ব্যাপকভাবে আসবাবপত্র ও গৃহ নির্মাণের খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেমসহ পাল্লা ও কৃষি সরঞ্জামাদি তৈরি এবং ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাতা ও ফল গবাদিপশুর প্রিয় খাদ্য। চা বাগানে ছায়া গাছরূপে ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিকরণে এবং শোভাবর্ধনকারী গাছ হিসেবে পার্ক, বাগান ও রাস্তার ধারে লাগানো হয়। এ গাছ ব্যাকটেরিয়া রাইজোবিয়ামের সহায়তায় বায়ুমন্ডলীয় নাইট্রোজেন গাছের শিকড়ে গুঁটি আকারে সংরক্ষণ করে রাখে।

● রেণ্ডি কড়ই বা রেইন ট্রি

বাংলা ও স্থানীয় নাম: শিরিষ (বরিশাল-পটুয়াখালী), রেইন ট্রি, ফুল কড়ই (চট্টগ্রাম), রেন্ডি কড়ই, বিলাতি শিরিষ, বৃষ্টি গাছ ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Samanea saman*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

রেইন ট্রি প্রকৃতপক্ষে বনজ বৃক্ষ নয়। এর আদি নিবাস হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এটি বিদেশ থেকে এনে আমাদের দেশে প্রবর্তন ও লাগানো হয়। রেইন ট্রি বাংলাদেশের সর্বত্র এভিনিউ, ছায়া প্রদানকারী, কাঠ ও জ্বালানি হিসেবে লাগানো হয়। রেইন ট্রি অপেক্ষাকৃত স্যাঁতসেঁতে ও ভিজা মাটিতে ভালো জন্মায়। গ্রামগঞ্জে, শহরে, বসত বাড়িতে, রাস্তার পাশে ও বিনোদনমূলক পার্কে লাগানো রেইন ট্রি গাছ দেখা যায়।

গাছের বিবরণ

রেইন ট্রি বড় আকৃতির দ্রুত বর্ধনশীল পাতাঝরা বা আধা পাতাঝরা বৃক্ষ, উচ্চতায় ২০-২৫ মিটার বা সর্বোচ্চ ৪০ মিটার এবং বুক সমান উচ্চতায় গাছের বেড় ১৫০-২৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কাণ্ড খাটো, গোলাকার এবং গাছের মাথায় ডালপালাগুলোর বিস্তৃতি ছাতার মতো মুকুট (crown) আকৃতির। বাকল পুরু, অমসৃণ ও কালচে-ধূসর বর্ণের। পাতা যৌগিক, পত্রফলকে পত্রক সংখ্যা ৬-১০ জোড়া। পত্রকগুলো ডিম্বাকার, কিনারা মসৃণ ও আগা সূচালো। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত গুচ্ছাকারে হালকা লাল বর্ণের হালকা ঘ্রাণযুক্ত একাধিক সংখ্যক ফুল ফোটে। ফল পড জাতীয় দেখতে শিমের মতো। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে পরিপক্ক ফল/পড কালচে বাদামি বর্ণের হয়। প্রায় দুই মাস পর্যন্ত পাকা শুকনা ফল গাছে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। প্রতিটি ফল একাধিক গিঁটযুক্ত ও ফলের ভিতরকার বাদামি-কালো বর্ণের আঠালো পাল্পের মধ্যে ১৫-২০টি করে বীজ রয়েছে। বীজগুলো ছোট, ডিম্বাকার, চ্যাপ্টা ও গাঢ় বাদামি বর্ণের।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

গাছের তলাতে প্রাকৃতিকভাবে বীজ থেকে চারা ও গাছ জন্মায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে সংগৃহীত ফল/পড রোদে ৫-৭ দিন শুকিয়ে লাঠির মৃদু আঘাতে বীজ বের করতে হয়। নার্সারিতে পলিথিন ব্যাগে সংগৃহীত বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। বপনের পূর্বে বীজ ফুটন্ত গরম পানিতে ৩০-৪০ সেকেন্ড সময় চুবিয়ে এবং পরে ২৪ ঘণ্টা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে বপন করলে অঙ্কুরোদগমের হার অধিক পাওয়া যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

রেইন ট্রির অসার কাঠ হলুদাভ, তবে সার কাঠ হালকা বাদামি বর্ণের। কাঠ মধ্যম ভারী, শক্ত, মজবুত ও টেকসই। কাঠ দিয়ে ব্যাপকভাবে আসবাবপত্র, গৃহ নির্মাণের খুঁটি, দরজা-জানালার ফ্রেম ও নৌকা তৈরি, কৃষি সরঞ্জামাদি, ভিনিয়ার ও প্লাইউড এবং ডালপালা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাতা ও ফল গবাদিপশুর প্রিয় খাদ্য। রেইন ট্রি ছায়াপ্রদানকারী এবং শোভাবর্ধনকারী এভিনিউ গাছ হিসেবে রাস্তার পাশে ও পার্ক এলাকায় লাগানো হয়। উত্তরবঙ্গে রেইন ট্রি লাক্ষা পতঙ্গের আশ্রয়ী গাছ হিসেবে ব্যবহৃত হয় ব্যাকটেরিয়া রাইজোবিয়ামের সহায়তায় বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন গাছের শিকড়ে গুঁটি আকারে সংরক্ষণ করে রাখে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

লম্বু

বাংলা ও স্থানীয় নাম: লম্বু
বৈজ্ঞানিক নাম: *Khaya anthotheca*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

লম্বু গাছ উষ্ণমন্ডলীয় আফ্রিকার নিজস্ব দেশিয় প্রজাতি হিসেবে পরিচিত। লম্বু আমাদের দেশে একটি বিদেশি বা বহিরাগত প্রজাতির গাছ যা নার্সারি ব্যবসায়ীগণ ২০০০ সালের দিকে ভারত থেকে নিয়ে আসেন। প্রাথমিকভাবে দেশের দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বসত বাড়িতে এর আবাদ শুরু হয়। এটি অতি দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় প্রজাতিটির প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। বর্তমানে সারা দেশব্যাপী এর আবাদ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গাছের বিবরণ

লম্বু একটি লম্বা আকৃতির হালকা ডালপালাযুক্ত অতি দ্রুত বর্ধনশীল চিরসবুজ বা অর্ধ-পাতাঝরা বৃক্ষ। উচ্চতায় ৩০-৬০ মিটার এবং গাছের বেড় প্রায় ১২০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। গাছের বার্ষিক গড় বৃদ্ধি প্রায় ১.৫ মিটার। প্রধান কান্ড সোজা সিলিন্ডার আকৃতির এবং ২০-৩০ মিটার পর্যন্ত কান্ড ডালপালা বিহীন। বয়স্ক গাছের গোড়াতে ঠেসমূল রয়েছে। বাকল পুরু, মসৃণ এবং ধূসর-বাদামি বর্ণের। ডালপালার আগায় গুচ্ছাকারে সজ্জিত পাতাগুলো যৌগিক ধরনের এবং ৪-৭ জোড়া পত্রকযুক্ত। পত্রকগুলো আয়তাকার, লম্বায় ৫-২০ সেন্টিমিটার ও চওড়ায় ২-১০ সেন্টিমিটার, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। নতুন গজানো পাতা হালকা লালচে বর্ণের। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে একই গাছে আলাদাভাবে পুরুষ ও স্ত্রী পুষ্পবিন্যাসে ছোট আকৃতির মিষ্টি ঘ্রাণযুক্ত সাদা বর্ণের ফুল ফোটে। জুলাই-আগস্ট মাসে ফল ধরে। ফল দেখতে অনেকটা মেহেগনির মতো ডিম্বাকার, শক্ত ও কাষ্ঠল এবং ৪-৫ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। পরিপক্ক ফল ধূসর-বাদামি বর্ণের এবং ফল আপনা-আপনিভাবে ফেটে গিয়ে বীজগুলো বাতাসের সাহায্যে অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়ে। বীজ চ্যাপ্টা ধরনের, হালকা বাদামি বর্ণের ও কিনারাব্যাপী পাখনাযুক্ত। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা প্রায় ২,৮০০-৩,০০০টি। বীজের আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত এবং বেশি দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায় না।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

সাধারণত বীজজাত চারা দিয়ে বংশ বিস্তার হয়। সদ্য সংগৃহীত বীজ নার্সারিতে পলিব্যাগে বপন করতে হয়। চারা গজানো বা অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা প্রায় ৮০-৮৫ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ৮-৩৫ দিন।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

লম্বুর অসার কাঠ ফ্যাকাসে-বাদামি এবং সার কাঠ লালচে-বাদামি থেকে গাঢ় লাল বর্ণের। কাঠ মধ্যম ভারী, নরম বা মধ্যম শক্ত ও মধ্যম টেকসই-মজবুত, ছত্রাক প্রতিরোধী, তবে ঘুণপোকায় আক্রান্ত করে থাকে। লম্বুর মূল্যবান কাঠ থেকে ভালো ভিনিয়ার, আসবাবপত্র, ফ্লোরিং,প্যানেলিং, কেবিনেট কাজে, বাক্স, দরজা-জানালার ফ্রেম, খেলাধূলা ও খেলনা সামগ্রী, গান-বাজনার বাদ্যযন্ত্র, জ্বালানি ও কয়লা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। আস্ত কান্ড খোদাই করে ডিঙ্গি জাতীয় নৌকা বানানো হয়। আফ্রিকার কঙ্গোতে লম্বুর পাতাকে তীর-ধনুকের বিষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। লম্বুর বাকল কুইনানের মতো তিতা স্বাদযুক্ত হওয়ায় এর নির্যাস আফ্রিকাতে ভেষজরূপে সর্দিজ্বর, ঠান্ডা, কাশি, নিউমোনিয়া, তলপেট ব্যাথা, বমি ও গনোরিয়া নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। দেহের উপরিভাগে সৃষ্ট ক্ষত নিরাময়ে বাকলের ক্বাথ ব্যবহার করা হয়। বাকল থেকে লালচে-বাদামি রঙ পাওয়া যায়। শিকড়ের নির্যাস রক্তশুন্যতা, আমাশয় ও মলদ্বার জনিত রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বীজ থেকে প্রাপ্ত তেল মাথার চুলে উকুন নির্মূল করতে ব্যবহার করা হয়।

তাল

বাংলা ও স্থানীয় নাম: বাংলা ও হিন্দিতে তাল, তেলেগু ভাষায় তাড়ী, তামিল ভাষায় পালাম, পানাই, বার্মিজ ভাষায় ট্যান এবং মাদ্রাজী ভাষায় ট্যামার বলা হয়।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Borassus flabellifer*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

আমাদের দেশে সর্বত্র কমবেশি তাল গাছ রয়েছে। তবে উপকূলীয় জেলা খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী এবং যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় তাল গাছ বেশি দেখা যায়। তাল গাছ পুকুর পাড়, রাস্তার পাশে ও পরিত্যক্ত জমিতে সারি করে লাগানো হয়।

গাছের বিবরণ

তাল গাছ একটি অতি পরিচিত সপুষ্পক একবীজপত্রী চিরসবুজ দীর্ঘজীবী একলিঙ্গ বিশিষ্ট বৃক্ষ। গাছ উচ্চতায় প্রায় ৩০-৪০ মিটার এবং গোড়ার অংশের বেড় বা ব্যাস প্রায় ১০০-১৭০ সেন্টিমিটার ও আগার দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে ব্যাস ৪০-৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। এ গাছ কমবেশি ১০০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। গাছের গোড়াতে রয়েছে প্রচুর গুচ্ছমূল বা শিকড়। এ সকল শিকড় মাটির গভীরে প্রায় ৬-১০ মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে। তাল গাছের রয়েছে শাখা-প্রশাখা বিহীন সোজা লম্বাটে নলাকার একক কান্ড এবং বাকল অমসৃণ কালচে বর্ণের। গাছের পুরো কান্ড জুড়ে রয়েছে ঝরে পড়া পাতার অসংখ্য রিং চিহ্ন। গাছের মাথায় রয়েছে পাখা আকৃতির ২৫-৪০টি যৌগিক পাতা। পাতাগুলো লম্বায় প্রায় ২.০-২.৫ মিটার এবং পাতার গোড়ার অংশের চ্যাপ্টা ও শক্ত বোটার দুই কিনারা জুড়ে রয়েছে সারিবদ্ধভাবে করাতের মতো ধারালো কালো বর্ণের দাঁত। তালগাছের পুরুষ ও স্ত্রী গাছ আলাদা এবং ১০-১২ বছর বয়সের গাছে ফুল-ফল ধরে। তাল গাছে জানুয়ারি-মার্চ মাসে ফুল আসে। শুধুমাত্র স্ত্রী গাছে ফুল-ফল ধরে এবং প্রতিটি গাছে ১৫-২০টি করে কাঁদি ধরে। প্রতি কাঁদিতে গুচ্ছাকারে প্রায় ২০-৩০টি করে তাল ফল ধরে।

ফলন

সাধারণত তাল গাছ লাগানোর ১০-১২ বছর পর ফল দিতে থাকে। একটি পূর্ণ বয়স্ক তাল গাছ সাধারণত বছরে গড়ে ৪০০-৫০০টি, তবে ক্ষেত্রবিশেষে ৮০০-১,০০০টি ফল দিয়ে থাকে। এক মৌসুমে সাধারণত একটি তাল গাছ থেকে ৩০-৩৫ কেজি গুড় পাওয়া যায়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

তাল গাছ গ্রামীণ অর্থনীতিতে জনগণের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের চিনি ও গুড়ের চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে। এটি সৌন্দর্যের প্রতীক ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি উপযোগী গাছ। এর প্রতিটি অংশের বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। তাল গাছ বাঁধ, রাস্তা, নদী, পুকুর, ডোবা ও নালার পাড়ের মাটির ক্ষয় ও ভাংগন রোধ করে। ঝড়, তুফান, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রতিরোধে সহায়ক গাছ। তাল গাছ ঝড়-তুফানে সহজে ভাঙ্গে না বিধায় ঝড় প্রতিহত (Wind break) করার কাজে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বন বিভাগ উপকূলীয় এলাকাগুলোতে তাল গাছ লাগানোর প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। তাল গাছ পাখিদের আশ্রয়স্থল ও বাবুই পাখির একান্ত পছন্দসই আবাসস্থল। শোভাবর্ধনকারী গাছ হিসেবে রাস্তার পাশে ও পার্ক এলাকায় তাল গাছ লাগানো হয়। তাল গাছের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার নিম্নে যথাক্রমে-

শিকড়: শিকড়ের মাঝের শক্ত আঁশ মাছ ধরার সরঞ্জামাদি ও কচি শিকড় মূত্র রোধে ব্যবহৃত হয়।

কান্ড: বর্ষাকালে আমদের দেশের হাওর-বাওর ও খাল-বিল এলাকায় যাতায়াত ও মাছ ধরার জন্য সনাতনী জলযান হিসেবে তাল গাছের গোড়ার ১৫-২০ ফুট লম্বা আস্ত কান্ড মাঝামাঝি চিরাই ও খোদাই করে ভেতরে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি করা হয় এবং নৌকাজাতীয় সরু ডোঙ্গা/ডিঙ্গি বা কোন্দা তৈরি করে ব্যবহার করা হয়। বয়স্ক তাল গাছের আঁশযুক্ত সার কাঠ বেশ ভারী, শক্ত, মজবুত, টেকসই, দীর্ঘস্থায়ী ও ঘুন পোকা প্রতিরোধী। গৃহ নির্মাণ ও কৃষি কাজে লাঙ্গলের 'ঈশ' তৈরিতে কাঠ ব্যবহৃত হয়। ইদানিং ইটের ভাটাতে কান্ড ব্যবহার করা হচ্ছে যা তাল গাছের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ।

পাতা: পাতার গোড়ার চ্যাপ্টা বোটা পানিতে ভিজিয়ে পচিয়ে প্রাপ্ত শক্ত আঁশ দিয়ে দড়ি বানানো, মাছ ধরার সরঞ্জামাদি, বেড়া, কুলা, ঘুনি বাঁধার কাজে, ব্রাশ ও পাপোশ তৈরি করা হয়। মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির মাথার বিখ্যাত টুপি তালের আঁশ দিয়েই তৈরি। শুকনা বোটা ও পাতা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আমদের দেশে ষাটের দশক পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের হাতে খড়ি ও তাল পাতায় অংকিত বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালা শেখানো হতো। তাল পাতায় বর্ণমালা লেখার কাজে বাঁশের কঞ্চি থেকে তৈরি কলম ও কাঠ কয়লা দিয়ে তৈরি কালির ব্যবহার ছিল।

মধ্যযুগে যখন কাগজের প্রচলন ছিল না, তখন অনেক পুরনো সাহিত্যের পান্ডুলিপি তাল পাতায় লিখে রাখা হতো। তাল পাতার তৈরি হাত পাখার ব্যবহার অতি প্রচলিত। গরীব মানুষেরা ঘরের ছাউনিতে ও বেড়াতে তাল পাতা ব্যবহার করে থাকে। মাথার টুপি, ছাতা, ঝুড়ি, মাদুর, চাটাই, ব্যাগ, হ্যান্ড ব্যাগ, খেলনা, বাঁশি ইত্যাদি তৈরিতে পাতা ব্যবহৃত হয়। কেটে ফেলা তাল গাছের মাথার অংশের নরম মজ্জাশাঁস খাওয়া যায়।

পুষ্পমঞ্জরি: পুষ্পমঞ্জরিদন্ড থেকে আহরিত রস পুষ্টি গুণাগুণ সম্পন্ন। এ রস দিয়ে তাড়ি, সুরাসার (এলকোহল) ও ভিনেগার তৈরি করা হয়। রস আগুনে জ্বালিয়ে উন্নত মানের পাটালি গুড় পাওয়া যায় যা ভাতের সাথে ও বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাতলা গুড় থেকে তাল মিছরি তৈরি হয়। মৌমাছিরা তালের ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে থাকে।

ফল: কচি তালের শাঁস খাওয়া হয়। পাকা তালের আঁশ কচলিয়ে যে ঘন রস পাওয়া যায় তা নারিকেল ও গুড় সহযোগে রান্না করে খাওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের পিঠা, পুলি, বড়া, পায়েস, ক্ষীর, লাচ্ছি প্রভৃতি স্বাদের খাবার তৈরি করা হয়। গ্রামাঞ্চলে স্তুপাকার করে রেখে দেওয়া তালের গজানো আঁটিগুলো কেটে মধ্যকার সুস্বাদু নরম ফোঁপরা সরাসরি কাঁচা বা দুধ-চিনি সহযোগে রান্না করে খাওয়া হয়।

ভেষজ গুণাগুন

গ্রীষ্মকালে তালের রস একটি উৎকৃষ্ট পানীয়। এ রস শ্লেষ্মানাশক, ক্রিমিনাশক, মূত্র বৃদ্ধি করে, প্রদাহ ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময় করে। রস থেকে তৈরি তাল মিছরি সর্দি কাশির মহৌষধ এবং যকৃতের দোষ নিবারক ও পিত্তনাশক। কচি শিকড় মূত্র রোধে ব্যবহৃত হয়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

তালের বীজ থেকে চারা জন্মায় ও বংশ বিস্তার ঘটে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাকা তাল পাওয়া যায়। নির্বাচিত উন্নতমানের মাতৃগাছ থেকে পাকা তাল সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক ও সনাতন পদ্ধতিতে তালের চারা উৎপাদন করা যায়।

● সুপারি

বাংলা ও স্থানীয় নাম: গুয়ো বা গুয়া, সুপারি, তামুল (আরবি) ইত্যাদি
বৈজ্ঞানিক নাম: *Areca catechu*

গাছের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

আমাদের দেশে সর্বত্র কম-বেশী সুপারির চাষ হয়। তবে উপকূলীয় জেলা খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভিবাজার, হবিগঞ্জ, রংপুর ও পঞ্চগড় জেলায় সুপারির চাষ বেশি দেখা যায়। এ গাছ বিনা যত্নে বেড়ে ওঠে এবং উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু সহিষ্ণু ও লবণাক্ত পরিবেশে খাপ খাইয়ে বেড়ে ওঠে।

গাছের বিবরণ

সুপারি গাছ একটি অতি পরিচিত সপুষ্পক একবীজপত্রী চিরসবুজ বৃক্ষ। গাছ উচ্চতায় প্রায় ১৫-২০ মিটার বা সর্বোচ্চ ৩০ মিটার এবং গাছের বেড় প্রায় ১৫-২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। গাছের গোড়াতে রয়েছে প্রচুর গুচ্ছমূল বা শিকড়। গাছের কান্ড শাখা-প্রশাখা বিহীন ও সোজা নলাকার। গাছের পুরো কান্ড জুড়ে ঝরে পড়া পাতার অসংখ্য রিং চিহ্ন রয়েছে যাকে গিঁট বলা হয়। গাছের মাথায় রয়েছে বড় আকৃতির ৭-১২টি করে যৌগিক পাতা।

পাতাগুলো লম্বায় প্রায় ১.৫-২.০ মিটার এবং প্রতি পাতার মধ্যশিরার দু' সারিতে রয়েছে ৭০-৮০টি পত্রক। প্রতিটি পাতার গোড়ার অংশে রয়েছে চওড়া নৌকা আকৃতির পাতলা সীথ যা গাছের কান্ডকে ঘিরে আবৃত থাকে। বরিশাল অঞ্চলে এরূপ পাতলা সীথকে 'খোল' বলে থাকে। জানুয়ারি-মার্চ মাসে গাছের মাথায় ৩-৪টি করে পুষ্পমঞ্জুরি বের হয় যাকে সুপারির ছড়া বা কাঁদি বলা হয়। ছড়া বা কাঁদির উপরের দিকে মিষ্টি ঘ্রাণযুক্ত অসংখ্য পুরুষ ফুল ও নিচের দিকে কম সংখ্যক স্ত্রী ফুল ধরে। শুধুমাত্র স্ত্রী ফুল থেকে সুপারি নামক ফল সৃষ্টি হয়। সুপারি ফল গোলাকার বা ডিম্বাকার এবং একক বীজ বিশিষ্ট। কাঁচা ফল সবুজ বর্ণের এবং পাকা ফল হলুদাভ থেকে কমলা-লাল বর্ণ ধারণ করে। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ভাদ্র থেকে কার্ত্তিক মাস এবং উত্তরবঙ্গ ও সিলেট অঞ্চলে পৌষ থেকে ফালগুন মাসে সুপারি পাকে। প্রতিটি ফলের বোটাযুক্ত স্থানে পাতলা আকৃতির স্থায়ী বৃতি রয়েছে। ফলের ভিতর রয়েছে শক্ত গোলাকার বীজ।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

সুপারি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি উপযোগী গাছ। সুপারি গাছের প্রতিটি অংশের বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে। যেমন-

গাছঃ সুপারি গাছ সৌন্দর্যের প্রতীক। সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য অনেকে শোভাবর্ধক গাছ হিসেবে বাড়ির পুকুর পাড়ে, কৃষি খামারের চারিধারে ও জমির আইলে, রাস্তার পাশে ও বাড়ির প্রবেশ পথে সারিবদ্ধভাবে সুপারি গাছ লাগিয়ে থাকেন। সিলেট ও কক্সবাজার জেলার প্রতিটি গ্রামের সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে শোভা পাচ্ছে সুপারি গাছ।

কান্ডঃ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে সুপারি গাছের আস্ত কান্ড ঘরের খুঁটি, সাঁকো তৈরি, পানির পাইপ এবং চিরাই করে চটা বানিয়ে কৃষি ক্ষেতে বেড়া প্রদান, দাড়ি-পাল্লা নিক্তির হাতল ও লাঠি তৈরি, মাছের ঘেরে পাহাড়া দেয়ার টঙ ঘর তৈরি, গরীব মানুষের বসত ও রান্না ঘরের চালার ফ্রেম তৈরি, ঘরের বেড়া ও মাচা বা পাটাতন স্থাপন কাজে ব্যবহার করা হয়।

কাণ্ড থেকে বানানো শলা কৃষি ফসলে ও পানের বরজে পানের লতা আরোহণ কাজে ব্যবহার করা হয়। এক সময়ে দক্ষিণ অঞ্চলে কান্ড থেকে তৈরি শক্ত গোলাকার শলাকে লোহার রডের বিকল্প হিসেবে ঘরের জানালাগুলোতে ব্যবহার করা হতো। দেশের উত্তর অঞ্চলের জেলা পঞ্চগড়ের নিম্ন আয়ের স্থানীয় লোকজন কাঠের বিকল্প হিসেবে সুপারি গাছের শক্ত কাণ্ড দিয়ে ঘুমানোর উপযোগী সুন্দর সুন্দর চৌকি বা খাট বানিয়ে ব্যবহার করছে। এ সকল খাট 'পঞ্চগড়ের পালং' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। সুপারি গাছের মাথার নরম অংশ (মাতি) সুস্বাদু বিধায় কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া হয়। এ নরম মাতি কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে।

পাতা: দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে গরীব মানুষেরা বসত ঘর ও রান্না ঘরের চালার ছাউনি ও বেড়াতে এবং বসত বাড়ির আঙ্গিনা ও চারিধারে পাকা দেয়ালের বিকল্প হিসেবে সুপারির শুকনা পাতা ব্যবহার করে থাকে। একে স্থানীয়ভাবে 'আউলি বেড়া' বলা হয়। পান চাষের বরজগুলোর চারিধারে শুকনা পাতা দিয়ে ঘেরা বেড়া ও পান গাছে ছায়া প্রদানের জন্য বরজগুলোর উপরিভাগে শুকনা পাতা বিছিয়ে দেয়া হয়। মাদুর, ঝুড়ি ও জ্বালানি হিসেবে পাতা ব্যবহৃত হয়।

ফল: রাতে বাদুরেরা রসালো পাকা ফলের আঁশযুক্ত ছোবড়া চুষে রস খেয়ে থাকে। শুকনা ফলের ছোবড়া বা খোসা গদি, জাজিম ও হার্ডবোর্ড তৈরি এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলের ছড়া বা কাঁদি শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বীজ: সুপারির শক্ত বীজ দিয়ে পান চিবিয়ে খাওয়া হয়। বিশ্বের মাত্র ১০-২০ ভাগ জনগোষ্ঠী সুপারি দিয়ে পান চিবিয়ে খায়। চুনের সাথে সুপারি সিদ্ধ করে যে কুশা পাওয়া যায় তা রঙ তৈরিতে এবং পানিতে ফুটিয়ে পাওয়া সুপারির ক্বাথ কাপড়ের রঙ করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ভেষজ গুণাগুণ

সুপারিতে ভেষজ গুণাগুণ রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বিশ্বের প্রায় ৬০০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী সুপারিকে পানের সাথে চিবিয়ে খেতে ও ভেষজরূপে ব্যবহার করে থাকে। বিশ্বব্যাপী তামাক (নিকোটিন), এলকোহল ও ক্যাফেইনের পর চতুর্থ স্থানে রয়েছে সুপারি। সুপারির মিহি গুঁড়া পেটের অসুখ, কৃমি, রক্ত আমাশয়, অজীর্ণ, গর্ভবতী মেয়েদের রক্তশুন্যতা নিরাময় এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়া বদহজমে ও গাড়িতে যাতায়াতকালে বমির ভাব লাগলে পান-সুপারি খাওয়া হয়। পোড়ানো সুপারির কয়লা দিয়ে দাঁত মাজলে পাইওরিয়া ও দাঁতের অন্যান্য রোগের উপকার হয়। সুপারিতে রয়েছে অ্যারিকেন, অ্যারিকোলিন নামক উপক্ষার যা কৃমিনাশক হিসেবে পোষা কুকুরের পেটের কৃমি মিরাময় করে।

বংশ বিস্তার ও চারা উৎপাদন

বীজ থেকে সুপারির চারা জন্মায় ও বংশ বিস্তার ঘটে। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকা ফল পাওয়া যায়। সুস্থ সবল ও অধিক ফলন বিশিষ্ট মাতৃগাছ নির্বাচন করে উন্নত মানের পাকা ফল সংগ্রহ করতে হয়। প্রতিটি ফল এক একটি বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ হিসেবে সুপারিকে সংরক্ষণ করে রাখা যায় না। বীজ শুকিয়ে গেলে চারা গজানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। বিলম্ব না করে সংগৃহীত ফল ১ সপ্তাহের মধ্যে মাটিতে সরাসরি বপন বা নার্সারিতে পলিব্যাগে বা বীজতলায় চারা উৎপাদন করা যায়।

দেশি গাব

বাংলা ও স্থানীয় নাম: গাব, দেশি গাব, মাকুর-কান্ডি, কালা টেন্ডু ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক নাম: *Diospyros peregrine*

গাছের বিস্তৃতি ও উৎপাদন এলাকা

দেশি গাব গাছ সারা দেশব্যাপী কম-বেশি গ্রামগঞ্জের পরিত্যাক্ত স্যাঁতসেঁতে জায়গায়, নদী-নালা, পুকুর-ডোবা ও খালের পাড়ে প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়। কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি ও বরিশালের ও উপকূলীয় এলাকায় দেশি গাব গাছের বিস্তৃতি রয়েছে। এ গাছ বিনা যত্নে বেড়ে ওঠে এবং উপকূলীয় এলাকায় জলবায় সহিষ্ণু ও লবণাক্ত পরিবেশে খাপ খাইয়ে বেড়ে ওঠে।

গাছের বিবরণ

দেশি গাব ছোট থেকে মাঝারি আকারের এবং প্রচুর ডালপালা বিশিষ্ট ঝোপালো ধরনের চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ৮-১০ মিটার পর্যন্ত হয়। প্রধান কাণ্ড খাটো, গোলাকার, প্রচুর খাঁজ ও গিঁটযুক্ত এবং বাকল পুরু, অমসৃণ এবং কালচে ধূসর বর্ণের। পাতা পুরু, বোটাযুক্ত, আয়তাকার, লম্বায় ১০-২০ সেন্টিমিটার এবং চওড়ায় ৪-৭ সেন্টিমিটার, কিনারা সামান্য ঢেউ খেলানো, গোড়ার অংশ গোলাকার এবং আগা সূচালো। মার্চ-এপ্রিল মাসে একই গাছে আলাদাভাবে সাদাটে বা ক্রিম বর্ণের ছোট আকারের পুং ফুল ও বড় আকারের স্ত্রী ফুল ফোটে। ফল ডিম্বাকার, প্রায় ৫ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট, বোটাতে স্থায়ী বৃতিযুক্ত রয়েছে। জুন-জুলাই মাসে পরিপক্ক ফলগুলো হলদেটে বর্ণের হয়। পাকা ফল মাংসল, রসালো, মিষ্টিঘ্রাণ এবং খাওয়ার উপযোগী। ফলের কেন্দ্রভাগে ৫-৮টি করে শক্ত চ্যাপ্টা বীজ রসালো পাল্পের মধ্যে ছড়ানো থাকে।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে বীজ থেকে চারা ও বংশ বিস্তার ঘটে। জুন-জুলাই মাসে সংগৃহীত পাকা ফল চটকিয়ে বীজ বের করা হয়। এ ছাড়া ফল খাওয়ার পর ফেলে দেয়া বীজ সংগ্রহ করে পলিব্যাগে বপন করে চারা উৎপন্ন করা হয়। চারা গজানো বা অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৮০-৯০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ১০-৩০ দিন।

ভেষজ গুণাগুণ

দেশি গাবের ফলের খোসার শুকনা গুঁড়া আমাশয় নিরাময় এবং একজিমা ও চর্মপীড়ার মলম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। পাতা, বাকল ও ফলের খোসা গরম পানিতে সেদ্ধ করে পান করলে যথাক্রমে কৃমি, পাতলা পায়খানা, ডায়রিয়া, মূত্র সংক্রান্ত রোগ ও আমাশয় নিরাময় করে। ফল মুখের ও গলার ঘা ধৌতকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঠ দিয়ে টেক্সটাইল মিলের সূতার মাকু তৈরি করা হয়। দেশি গাবের কাঠ অতি সহজে ঘুনপোকায় আক্রমণ করে বিধায় রাসায়নিক সংরক্ষণী প্রয়োগ করে গৃহ নির্মাণের কাজে কাঠ ব্যবহার করা হয়। রসালো পাকা ফল মানুষ, কাঠবিড়ালী ও পাখিরা খেয়ে থাকে। কাঁচা ও অপরিপক্ক ফলের আঠালো কষ পচন নিরোধক বিধায় মাছ ধরার জাল ও নৌকায় ব্যবহার করা হয়। গ্রামগঞ্জে গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত বাঁশের টুকরি ও শস্য দানা রাখার মোড়া বা পাত্রকে ঘুন পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে দেশি গাবের কষ ও ধানের তুষ একসাথে মিশিয়ে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বিলাতি গাব

বাংলা ও স্থানীয় নাম: বিলাতি গাব।
বৈজ্ঞানিক নাম: *Diospyros philippensis*

গাছের বিস্তৃতি ও উৎপাদন এলাকা

সারা দেশব্যাপী কম-বেশি বিলাতি গাবের লাগানো গাছের বিস্তৃতি রয়েছে। তবে লাগানো গাছের আধিক্য দেখা যায় দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলা পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরিশাল ও পটুয়াখালীতে। এ গাছ উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত পরিবেশে অভিযোজিত ও জলবায়ু সহিষ্ণু।

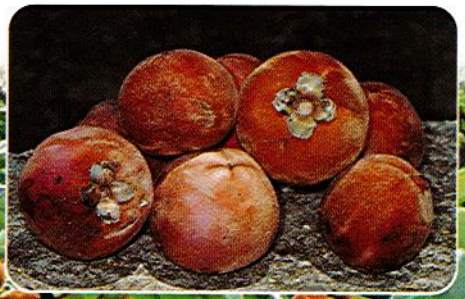

গাছের বিবরণ

বিলাতি গাব মাঝারি আকারের এবং প্রচুর ডালপালা বিশিষ্ট ঝোপালো ধরনের চিরসবুজ বৃক্ষ, উচ্চতায় ২৫-৩২ মিটার ও কান্ডের বেড় ৬০-৮০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। কাণ্ড সরল সোজা, গোলাকার এবং গোড়ার অংশে একাধিক খাঁজ রয়েছে। বাকল পুরু, মসৃণ এবং গাঢ় বাদামি বর্ণের। পাতা পুরু, বোটাযুক্ত, আয়তাকার, লম্বায় ১৫-২৫ সেন্টিমিটার ও চওড়ায় ৫-১০ সেন্টিমিটার, কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন গাছে সাদাটে বা ক্রিম বর্ণের ছোট আকারের পুং ফুল গুচ্ছাকারে এবং এককভাবে বড় আকারের স্ত্রী ফুল ফোটে। ফল আকারে বড় ডিম্বাকার ধরনের লম্বায় প্রায় ৮ সেন্টিমিটার। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পাকা ফলগুলো লালচে বর্ণের হয়। কদাচিৎ হলদে বর্ণের পাকা ফল দেখা যায়। পাকা ফলের আবরণ মোলায়েম ও মখমলযুক্ত এবং মধ্যভাগে রয়েছে খাওয়ার উপযোগী কম মিষ্টিযুক্ত মাংসল নরম সাদাটে পাল্প। ফলের কেন্দ্রভাগে পাল্পের মধ্যে ৪-৮টি শক্ত বীজ বা আঁটি রয়েছে। সম্প্রতি পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ বীজ বিহীন বিলাতি গাবের জাত উদ্ভাবন করেছেন।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

সাধারণত বীজজাত চারা দিয়ে বিলাতি গাবের বংশ বিস্তার ঘটে। সংগৃহীত পাকা ফল চটকিয়ে বীজ বের করা হয়। এ ছাড়া ফল খাওয়ার পর ফেলে দেয়া বীজ সংগ্রহ করে পলিব্যাগে বপন করে চারা উৎপন্ন করা হয়। চারা গজানো বা অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৮০-৯০ ভাগ। চারা গজাতে সময় লাগে ২০-২৪ দিন। এছাড়া অন্যান্য দেশে গুঁটি কলম, জোড় কলম, চোখ কলম পদ্ধতিতে চারা

গুরুত্ব ও ব্যবহার

বিলাতি গাবের প্রধান কান্ড সোজা হওয়ায় দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোতে ঘরের খুঁটি হিসেবে ও গৃহ নির্মাণের অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। কাঠ গাঢ় ধূসর বর্ণের, শক্ত, টেকসই ও মজবুত। আসবাবপত্র, কেবিনেট, যন্ত্রপাতির হাতল, ববিন ইত্যাদি তৈরি ও জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহৃত হয়। পাকা ফল মানুষ, কাঠবিড়ালী ও পাখিরা খেয়ে থাকে। বিলাতি গাবের ফল রক্ত-আমাশয় ও উদারাময় রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

উপকূলীয় গ্রামীণ এলাকার বাঁশের পরিচিতিমূলক বিবরণ

পরিচিতি: বাঁশ একটি দ্রুত বর্ধনশীল কাষ্ঠল বৃক্ষবৎ ঘাস বিশেষ একবীজপত্রী ও বহুবর্ষজীবী চিরসবুজ উদ্ভিদ। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলসমূহের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে সর্বাধিক পরিমাণে বাঁশ জন্মায়। পলি মাটিযুক্ত নদী-খাল ও নালা-ছড়ার পাড়ে এবং পাহাড়ি ঢালের নিচু স্যাঁতসেঁতে জায়গাতে বাঁশ ভালোভাবে জন্মায়। তবে বাঁশ লবণাক্ত ও জলামগ্ন অবস্থাতে টিকে থাকতে পারে না।

উপকূলীয় গ্রামীণ এলাকায় জন্মানো বাঁশের পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

বোরাক বাঁশ

বাংলা ও স্থানীয় নাম: এটি বরাক, বরুয়া, তেলি বরুয়া, শিল বরুয়া, হিল বরুয়া, বালকু, বালকুয়া, গিটাবরা, বড় বাঁশ, ভাইল্লো বাঁশ ইত্যাদি নামে পরিচিত।
বৈজ্ঞানিক নামঃ *Bambusa balcooa*

বাঁশের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

সারা দেশব্যাপী বোরাক বাঁশের কম-বেশি বিস্তৃতি রয়েছে। তবে বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও ঢাকার গ্রামীণ এলাকায় আবাদকৃত বোরাক বাঁশের বিস্তৃতি বেশি। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার বসত বাড়ি ও পতিত জমিতে বোরাক বাঁশের চাষ করা হয়। সমতল ভূমির পলি মাটিযুক্ত ও সহজে পানি নিষ্কাশন হয় এমন এলাকায় বোরাক বাঁশ ভালো জন্মায়। তবে লবণাক্ত ও জলামগ্ন অবস্থাতে টিকে থাকতে পারে না।

বাঁশের বৈশিষ্ট্য

বোরাক একটি দ্রুত বর্ধনশীল অতি পরিচিত গ্রামীণ বাঁশ। এটি বড় আকৃতির ঝাড় সৃষ্টিকারী বাঁশ, লম্বায় ১৮-৩০ মিটার এবং কান্ডের ব্যাস ৬-১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট। কাণ্ড সরল সোজা ও ফাঁপা নলাকার ধরনের। পুরো কান্ড জুড়ে ঘন গিঁট বা পর্ব ও ফাঁপা পর্বমধ্য রয়েছে। কান্ডের মাঝামাঝি থেকে উপর পর্যন্ত গিঁট বা পর্বগুলোতে গুচ্ছাকারে ১-৩টি বড় আকারের শক্ত কঞ্চি জন্মায়। তবে কান্ডের নিচের দিকের গিঁট বা পর্বগুলোতে জন্মানো কঞ্চিগুলো শক্ত, পাতা বিহীন এবং অনেক ক্ষেত্রে সূচালো ধরনের, তবে কাঁটাযুক্ত নয়। গিঁটগুলোর মধ্যবর্তী স্থানের দীর্ঘতা ২০-৪০ সেন্টিমিটার এবং প্রাচীরের পুরুত্ব প্রায় ১০-১৫ মিলিমিটার। গিঁট বা পর্বগুলোর উপরিভাগে সাদাটে রোমশযুক্ত একটি বন্ধনী বা বলয় রয়েছে। বলয়ের নিচে ছোট ও খাট ধরনের চুল সদৃশ শিকড় রয়েছে। তবে বাঁশের গোড়ার দিকে দাঁড়ির মতো লম্বা ধরনের চুল সদৃশ প্রচুর শিকড় দেখা যায়। কান্ড সীথ বাদামি বর্ণের, লম্বায় ২৫-৩৫ সেন্টিমিটার, অরিকল বিহীন এবং ত্রিকোণাকার বিশিষ্ট ব্লেডযুক্ত। পাতা লম্বায় ১৫-৩০ সেন্টিমিটার এবং চওড়ায় ২.৫-৫.০ সেন্টিমিটার, পাতার কিনারা অমসৃণ এবং আগা সূচালো। বোরাক বাঁশে ফুল আসার আবর্তকাল ৩৫-৪৫ বছর। দীর্ঘ মেয়াদীতে ফুল-ফল আসে এবং ৩ বছর যাবৎ প্রচুর ফুল-ফল দিয়ে অবশেষে ঝাড়ের সকল বাঁশ মারা যায়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

মুথা, কান্ড ছেদন, কঞ্চি কলম ও বীজের সাহায্যে বংশ বিস্তার ঘটে। সাধারণত মুথা বা কঞ্চি কলম লাগিয়ে বোরাক বাঁশের চাষাবাদ করা হয়। বর্ষাকালে এক থেকে দুই বছর বয়সের মুথা বা কঞ্চি কলম লাগানো হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

গৃহ নির্মাণের খুঁটি, আড়া, বীম, সিলিং ফ্রেম এবং বিল্ডিং নির্মাণকালে ছাদের সিলিং কাজে খুঁটি হিসেবে, মাছ ধরার সময় জাল ভাসিয়ে রাখার কাজে, সাঁকো নির্মাণে, আরোহণকৃত মই, জমি চাষের মই ও গরু-মহিষের জোয়াল, রিক্সার হুড ফ্রেম ও কৃষি সরঞ্জামাদি নির্মাণে বোরাক বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কাগজ, কাগজের মন্ড, হস্ত ও কুটির শিল্পের সৌখিন দ্রব্যাদি তৈরিতে বোরাক বাঁশ ব্যবহৃত হয়। বোরাক বাঁশের কচি কোঁড়ল ভক্ষণীয় এবং রান্না করে খাওয়া যায়। পাতা গবাদিপশুর উপাদেয় খাদ্য।

বাইজ্যা বাঁশ

বাংলা ও স্থানীয় নামঃ এটি বারিয়ালা, বারগিয়া, বাশিনি, জাই, জাওয়া, ওরাগ, বালনা, বড় বাঁশ, বাংলা বাঁশ ইত্যাদি নামে পরিচিত।

বৈজ্ঞানিক নামঃ *Bambusa vulgaris*

বাঁশের বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

সারা দেশব্যাপী বাইজ্যা বাঁশের কম-বেশি বিস্তৃতি রয়েছে। তবে দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের জেলাগুলোতে বাইজ্যা বাঁশের বিস্তৃতি বেশি। বৃহত্তর যশোর, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলাসমূহে বাইজ্যা বাঁশের বিস্তৃতি ভালো। বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার বসত বাড়িতে, পলিমাটি যুক্ত সমতল স্যাঁতসেঁতে খোলা জায়গায়, পতিত জমিতে, নদী ও খালের পাড় ঘেষে বাইজ্যা বাঁশ লাগানো হয়। গ্রামীণ এলাকায় বাইজ্যা বাঁশ ভালো জন্মায়, তবে লবণাক্ত ও জলামগ্ন অবস্থাতে টিকে থাকতে পারে না।

বাঁশের বৈশিষ্ট্য

বাইজ্যা একটি দ্রুত বর্ধনশীল অতি পরিচিত গ্রামীণ বাঁশ। এটি বড় আকৃতির ও ঝাড় সৃষ্টিকারী বাঁশ, লম্বায় ১০-২০ মিটার এবং কান্ডের ব্যাস ৪-১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট এবং বাঁশের মাথাগুলো নিম্নমুখীভাবে ঝুলে থাকে। কাণ্ড সরল সোজা ও ফাঁপা নলাকার ধরনের। পুরো কান্ড জুড়ে ঘন গিঁট বা পর্ব ও ফাঁপা পর্বমধ্য রয়েছে। কান্ডের মাঝামাঝি থেকে উপর পর্যন্ত গিঁটগুলোতে গুচ্ছাকারে শক্ত বড় আকারের কঞ্চি জন্মায়। গিঁটগুলোর মধ্যবর্তী স্থানের দীর্ঘতা ২০-৪৫ সেন্টিমিটার এবং প্রাচীরের পুরুত্ব প্রায় ৭-১৫ মিলিমিটার। কান্ড সীথ ত্রিকোণাকার, লম্বায় ১৫-৪৫ সেন্টিমিটার, অরিকল এবং ব্লেডযুক্ত। পাতা লম্বায় ৬-৩০ সেন্টিমিটার এবং চওড়ায় ১-৪ সেন্টিমিটার, পাতার কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। সাধারণত বাইজ্যা বাঁশে ফুল-ফল দেখা যায় না এবং ফল পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে বাইজ্যা বাঁশে ফুল আসার আবর্তকাল

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

মুথা, কান্ড ছেদন, গিঁট কলম ও কঞ্চি কলমের সাহায্যে বংশ বিস্তার ঘটে। বাইজ্যা বাঁশের বীজ প্রাপ্তি অতি বিরল। আমাদের দেশ সাধারণত মুথা ও কঞ্চি কলমের সাহায্যে বাইজ্যা বাঁশের চাষাবাদ করা হয়। বর্ষাকালে এক থেকে দুই বছর বয়সের মুথা বা কঞ্চি কলম লাগানো হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

গৃহ নির্মাণের খুঁটি, আড়া, বীম, চালা ও সিলিং ফ্রেম এবং বিল্ডিং নির্মাণকালে ছাদের সিলিং কাজে খুঁটি হিসেবে, কলা গাছের ঠেস খুঁটি হিসেবে, মাছ ধরার সময় জাল ভাসিয়ে রাখার কাজে, সাঁকো নির্মাণে, আরোহণকৃত মই, জমি চাষের মই ও গরু-মহিষের জোয়াল, রিক্সার হুড ফ্রেম, আধিবাসীদের ধূমপান করার পাইপ, পানি সেচের পাইপ, আসবাবপত্র, ঝুড়ি ও কৃষি সরঞ্জামাদি নির্মাণে বাইজ্যা বাঁশের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। কাগজ, কাগজের মন্ড, হস্ত ও কুটির শিল্পের সৌখিন দ্রব্যাদি তৈরিতে বাইজ্যা বাঁশ ব্যবহৃত হয়। কচি কোঁড়ল ভক্ষণীয় এবং রান্না করে খাওয়া যায়। পাতা গবাদিপশুর উপাদেয় খাদ্য।

তল্লা বাঁশ

বাংলা ও স্থানীয় নামঃ এটি তরলা, আইলি, কেয়িত্তা বাঁশ ইত্যাদি নামে পরিচিত।
বৈজ্ঞানিক নামঃ *Bombusa Tulda*

বিস্তৃতি ও প্রাপ্তিস্থান

সারা দেশব্যাপী তল্লা বাঁশের কম-বেশি বিস্তৃতি রয়েছে। তবে বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, বরিশাল ও পটুয়াখালীর গ্রামীণ এলাকায় লাগানো তল্লা বাঁশের বিস্তৃতি বেশি। এটি পাহাড়ি মিশ্র চিরসবুজ বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়। পলিমাটিযুক্ত সমতল ভূমিতে, খাল-নালা ও ছড়ার পাড়ে এবং পাহাড়ি ঢালের নিচু স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে তল্লা বাঁশ ভালোভাবে জন্মায়। তবে লবণাক্ত ও জলামগ্ন অবস্থাতে টিকে থাকতে পারে না।

বাঁশের বৈশিষ্ট্য

তল্লা একটি দ্রুত বর্ধনশীল অতি পরিচিত গ্রামীণ বাঁশ। এটি মাঝারি আকৃতির ও ঝাড় সৃষ্টিকারী বাঁশ, লম্বায় ৬-২০ মিটার এবং কান্ডের ব্যাস প্রায় ৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। ঝাড়ের বাঁশগুলো ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট। কাণ্ড সরল সোজা ও নলাকার ফাঁপা ধরনের এবং পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট। কান্ড জুড়ে পাতলা গিঁট ও পর্বমধ্য রয়েছে। কান্ডের নিচ থেকে উপর পর্যন্ত গিঁটগুলোতে একাধিক কঞ্চি জন্মায়। গিঁটগুলোর মধ্যবর্তী স্থানের দীর্ঘতা ৩০-৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রাচীরের পুরুত্ব প্রায় ৫-১০ মিলিমিটার। গিঁটগুলোর উপরিভাগে সাদাটে রোমশযুক্ত একটি বন্ধনী বা বলয় রয়েছে। কান্ড সীথ ত্রিকোণাকার ও মোচাকৃতি ব্লেডযুক্ত। পাতা লম্বায় ২০-৩৫ সেন্টিমিটার এবং চওড়ায় ৩-৪ সেন্টিমিটার, পাতার কিনারা মসৃণ এবং আগা সূচালো। সাধারণত তল্লা বাঁশে ২৫-৪০ বছর পর ফুল-ফল আসে এবং ২ বছর যাবৎ প্রচুর ফুল-ফল দিয়ে অবশেষে ঝাড়ের সকল বাঁশ মারা যায়।

প্রজনন ও বংশ বিস্তার

মুথা, কান্ড ছেদন ও বীজের সাহায্যে বংশ বিস্তার ঘটে। তল্লা বাঁশের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যায়। বীজ থেকে চারা গজানোর হার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। সাধারণত মুথা পদ্ধতিতে তল্লা বাঁশের চাষাবাদ করা হয়। বর্ষাকালে এক থেকে দুই বছর বয়সের মুথা বা চারা লাগানো হয়।

গুরুত্ব ও ব্যবহার

গৃহ নির্মাণের খুঁটি ও বেড়া, আসবাবপত্র, ঝুড়ি, হস্ত শিল্পের কাঁচামাল, কঞ্চি দ্বারা চাঁচ ও দরমা দ্রব্যাদি তৈরি, রান্নাঘরে ব্যবহার্য তরি-তরকারি রাখার পাত্র, দেশিয় মাদুর, শস্যদানা রাখার পাত্র ও কাগজের মন্ডসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরিতে তল্লা বাঁশ ব্যবহৃত হয়। কচি কোঁড়ল ভক্ষণীয়, তবে স্বাদে হালকা তিতা। পাতা গবাদিপশুর উপাদেয় খাদ্য।

ARANNAYK
FOUNDATION
Conserving forests for the future
আরণ্যক ফাউন্ডেশন
বাড়ি # ২১, অ্যাপার্টমেন্ট # ২ ডি
ওয়েস্টান রোড, ডিওএইচএস
বনানী, ঢাকা-১২০৬
www.arannayk.org